প্রথম পুনশ্চ সংস্করণ
আশ্বিন ১৩৬৪

প্রকাশক
পুনশ্চ
১১৪ এন, ডাঃ এস. সি. ব্যানার্জী রোড,
কলকাতা ৭০০০১০

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
জয়নুল আবেদিনের আঁকা স্কেচের
সাহায্যে সুব্রত চৌধুরী

সূচীপত্র

জীবনানন্দ দাশ

কার্ত্তিকের ভোর — ১৩৫০

চারিদিকে ভাঙনের বড় শব্দ,
পৃথিবী ভাঙ্গার কোলাহল;
তবুও তাকালে সূর্য পশ্চিমের দিকে
অস্ত গেল, …… চাঁদের ফসল
পুবের আকাশে
হৃদয় বিহীনভাবে আন্তরিকতা ভালবাসে।

তেরোশো পঞ্চাশ সালে কার্ত্তিকের ভোর;
সূর্যালোকিত সব স্থান
যদিও লঙ্গরখানা,
যদিও শ্মশান,
তবুও কল্কির ঘোড়া সরায়ে মেয়েটি তার যুবকের কাছে
সূর্যালোকিত হয়ে আছে।

এই শতাব্দী — সন্ধিতে মৃত্যু

(অগণন সাধারণের)

সে এক বিচ্ছিন্ন দিনে আমাদের জন্ম হয়েছিল
ততোধিক অসুস্থ সময়ে
আমাদের মৃত্যু হয়ে যায়।
দূরে কাছে শাদা উঁচু দেয়ালের ছায়া দেখে ভয়ে
মনে করে গেছি তাকে—ভালোভাবে মনে ক'রে নিলে—
এইখানে জ্ঞান হতে বেদনার শুরু—
অথবা জ্ঞানের থেকে ছুটি নিয়ে সান্ত্বনার হিম হ্রদে একাকী লুকালে
নির্জন স্ফটিকস্তম্ভ খুলে ফেলে মানুষের অভিভূত উরু
ভেঙ্গে যাবে কোনো এক রম্য যোদ্ধা এসে।
নরকেও মৃত্যু নেই—প্রীতি নেই স্বর্গের ভিতরে;
মর্ত্যে সেই স্বর্গ নরকের প্রতি সৎ অবিশ্বাস
নিস্তেজ প্রতীতি নিয়ে মনীষীরা প্রচারিত করে।

অমিয় চক্রবর্তী

অ ন্ন দা ও

অন্ন দাও, অন্ন দাও—
গলির মোড়ে কি জাগ্‌বে না ধানশীষ?
জমানো সোনার রোদের সবুজ অন্ন
হাওয়ায় দোলানো আকাশে অন্ন
ভরানো মাটিতে লাগবে না?
প্রাণের ক্ষুধায় অন্ন দাও।
রাতের কান্না দিনের কান্না ঘুরে ঘুরে ওঠে
অন্ন দাও।

মূর্ছা চোখের অন্ন দাও,
বোবা বুক বলে, অন্ন দাও।
কোথাও পাথর ভাঙে না, ঝরে না অন্ন জল,
কঠিন শহরে অন্ন নেই।
ঝিমঝিম ধরে শিরায় মৃত্যু—
শরীর শুকোয়, কণ্ঠ শুকোয়, পড়ে থাকে দেহ,
অন্ন নেই।
সোনার বাংলা শূন্যে তাকায় ঃ অন্ন নেই।
ভাঙ্গা ভাণ্ডারে মাটি নিরন্ন।

অন্ন আছে,
লোভের মরাইয়ে ধ্বংসগোলায় অন্ন আছে,
পণ্যরাষ্ট্র জানে ভুবনের অন্নের পথ।
সে-পথ বন্ধ।
ভরা বন্যায় অন্ন ভেসেছে—অন্ন আছে,
ঝক্‌ঝকে ঘরে ঝড়ে মারীতেও—নেই কি অন্ন?
লক্ষ কলের অন্ন আছে।
শহর-গ্রামের কোটি জনতার
নেই শুধু চোখে সবুজ অন্ন,
সোনার অন্ন।
অন্ন দাও—
প্রাণের ক্ষুধায় একটু অন্ন দাও॥

অন্নার্থীর সাহায্যে, ১৩৫০

১ ৩ ৫ ০

হাত থেকে তার পড়ে যায় খসে
        অবশ আধ্‌লা ধুলোয়।
চোখ ঠেকে খোলা অসাড় শূন্যে।
        প্রাণ, তুমি আজো আছ ঐ দেহে,
        আছ মুমূর্ষু দেশে।
কঙ্কাল গাছ ভাদ্রশেষের ভিখারী ডালটা নাড়ে,
কড়া রোদ্দুর প্রখর দুপুরে ফাটে।

    হাতের আঙুলে স্নেহ দিয়েছিলে
    চোখে চেনা জাদু আপন ঘরের বুকে—
বাংলার মেয়ে, এসেছিল তার জীবনের দাবি নিয়ে,
দুদিনের দাবি ফলন্ত মাঠে, চলন্ত সংসারে;
কতটুকু ঘেরে কত দান ফিরে দিতে।
—সামান্য কাজে আশ্চর্য খুশি ভরা।
আজ শহরের পথপাশে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কোথা
সভ্যতা ছোটে তেরোশো পঞ্চাশিকে॥

অন্নার্থীব সাহায্যে, ১৩৫০

নি ম ন্ত্র ণ

        হায়রে, নেমন্তন্ন।
সাগরপারের লোক, দেখে যাও
অন্য দেশের শিশু,
ডাকছে চোখ খুশিতে উজল
        চল্‌রে, নেমন্তন্ন।

        ভাঙা ভাণ্ডের তলানিতে
এই হোলো তার প্রাণের নিমন্ত্রণ ঃ
    কাঙাল সারি বসেছে পথে, উপরে ওড়ে কাক,
    সেখানে ছুটে-আসা।—
যে-শিশুরা আলোয় নামে, একটু পেয়েই হাসে
    তাদের জন্যে এই আয়োজন।

কেমন প্রজা, কেমন রাজা, কেমন সোনার দেশ;
ভারত-মায়ের শিশুকে দেখে যাও।

ওরাও বাঁচতে চায়।
বড়ো হয়ে উঠবে প্রাণে, ভরা বাংলার কোলে—
মাটিতে ফল, মাটিতে ধান
—এদেরই নেমন্তন্ন ছিল।
বাপ-মায়ের মূর্ছাদেহ, পাশেই খেলে শিশু
শীর্ণতায় চমকে শিখা প্রাণের,
দোকানে রং, চেয়ে দেখ্‌ছে, চল্‌ছে গাড়ি,
উঁচু বাড়িতে নীল পর্দা,
সেপাই ঘোরে বড়ো দরজায়—
দূরে, দূরে, দূরে।

দেখতে দেখ্‌তে ক্লান্ত হঠাৎ গড়িয়ে পড়ে,
চোখের সাম্‌নে লক্ষ লোকের—
—ফুটপাথেই ফুরোয় নেমন্তন্ন॥

অন্নার্থীর সাহায্যে, ১৩৫০

অ ন্ন দা তা

পাথরে মোড়ানো হৃদয় নগর
জন্মে না কিছু অন্ন—
এখানে তোমরা আসবে কিসের জন্য?
বেচাকেনা আর লাভের খাতায়
এখানে জমানো রক্তপণ্য—
যারা দান দেয় তারা মুনাফায়
সাধুতার সুদ ক'ষে তবে হয় দাতা,
নয়তো তারাও রাষ্ট্রচাকায় পিষ্ট, দরদী নাগর ঃ
তাদের দেওয়ায় ফলাবে না ধান শান-বাঁধা কলকাতা।

আসো যদি তবে শাবল হাতুড়ি
আনো ভাঙবার যন্ত্র,
নতুন চাষের মন্ত্র।

গ্রামে যাও, গ্রামে যাও,
এক লাখ হয়ে মাঠে নদীধারে
অন্ন বাঁচাও, পরে সারে সারে
চাবেনা অন্ন, আনবে অন্ন ভেঙে এ দৈত্যপুরী,
তোমরা অন্নদাতা।
জয় করো এই শান-বাঁধা কলকাতা॥

অন্নার্থীর সাহায্যে, ১৩৫০

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ফ্যা ন

নগরের পথে পথে দেখেছ অদ্ভুত এক জীব
ঠিক মানুষের মতো
কিংবা ঠিক নয়,
যেন তার ব্যঙ্গ-চিত্র বিদ্রূপ-বিকৃত!
তবু তারা নড়ে চড়ে, কথা বলে, আর
জঞ্জালের মতো জমে রাস্তায় রাস্তায়,
উচ্ছিষ্টের আস্তাকুঁড়ে বসে বসে ধোঁকে,
—আর ফ্যান চায়।

রক্ত নয়, মাংস নয়,
নয় কোনো পাথরের মতো ঠাণ্ডা সবুজ কলিজা,
মানুষের সৎভাই চায় শুধু ফ্যান।
তবু যেন সভ্যতার ভাঙে নাকো ধ্যান।
একদিন এরা বুঝি চষেছিলো মাটি
তারপর ভুলে গেছে পরিপাটি
কত ধানে কত হয় চাল,
ভুলে গেছে লাঙলের হাল
কাঁধে তুলে নেওয়া যায়,
কোনো দিন নিয়েছিলো কেউ।
জানে নাকো আছে এক সমুদ্রের ঢেউ
পাহাড় টলানো।
অন্ন ছেঁকে তুলে নিয়ে,
ক্ষুধাশীর্ণ মুখে যেই ঢেলে দিই ফ্যান,
মনে হয় সাধি একি পৈশাচিক নিষ্ঠুর কল্যাণ!
তার চেয়ে রাখি যদি ফেলে,
পচে পচে আপন বিকারে
এই অন্ন হবে নাকি মৃত্যুলোভাতুরা
অগ্নি-জ্বালাময় তীব্র সুরা?
রাজপথে কচিকচি এই সব শিশুর কঙ্কাল—মাতৃস্তন্যহীন,
দধীচির হাড় ছিলো এর চেয়ে আরো কি কঠিন?

শারদীয় যুগান্তর, ১৩৫০

বুদ্ধদেব বসু

শ্রা ব ণ

হে শ্রাবণ, হৃদয়ের প্রিয়তম ঋতু, ক্ষমা করো
এবারে কবিরে, এবার আনন্দঘন অভ্যর্থনা
অকুণ্ঠিত কবি-কণ্ঠে উচ্ছ্বসিত হ'লো না, হ'লো না
তোমার উদ্দেশে। ব্যর্থ হ'লো স্বপ্নক্ষর ঝরোঝরো
স্বর, ব্যর্থ নিশীথ-সৌরভ। ক'লকাতার কর্মখর
মধ্যদিনে উজ্জয়িনী নেমে আসে, প্রাণের দোলনা
তবু তো দোলে না ছন্দে, অবরুদ্ধ সুরের বেদনা
দুর্জ্ঞেয় পীড়ার মতো জীবনের স্বাদুসুখহর।

এবার শ্রাবণে দেখি বুভুক্ষার করাল রাক্ষস
রেখেছে বন্দিনী ক'রে জীবনের সোনার সীতারে,
লঙ্কার পাপাগ্নিধূমে দিকে-দিকে পুঞ্জিত প্রলয়।
কবে দেখা দেবে রাম বিশ্বজয়ী নবমেঘভারে
কালান্তক বজ্র বিস্ফোরণে, মুক্তির অমৃতরস
শ্রাবণ বর্ষণে ঢেলে!—এখনো কি হয় নি সময়?

দিগন্ত, ১৩৫০

বিষ্ণু দে

১ ৯ ৪ ৩ অ কা ল ব র্ষা

শহরে অকাল বর্ষা, আকাশে নীল কণ্ঠরোধ
সকাল না হতে কাঁপে ক্রন্দসী ও চালের আড়তে
অনাহারে অসহায় কাতারে কাতারে কোনোমতে
কুইনিনহীন দেহ ঢেকে কাঁপে ক্ষুধার্ত নির্বোধ
ভিখারি দেশের লোক আমাদেরই সভ্যতার ভার
যারা বয় আস্থাভরে, যারা ম'রে জীবিকা জোগায়
মৃত্যুঞ্জয় আমাদের, দধীচি সে ভিখারীর সার
বাংলার পথে পথে—বুঝি সারা হিন্দুস্থান ছায়
আবিশ্ব অনন্ত সাপ, প্রাণের সর্পিল গতিভরে
মৈনাকে বিপ্লব আনে, যুগান্তের বিষলালা ক্ষরে।
কাব্যে খ্যাত বাংলার বর্ষার আকাশ যে-আভায়
ভবিষ্যতে স্পন্দমান, সেই রৌদ্রে নীল কণ্ঠরোধ
প্রচণ্ড কালের হাস্যে, ইতিহাসে উত্তোলিত ক্রোধ
বাংলায় গ্রিসে, রোমে, ফ্রান্সে, চীনে, আংকোরে, জাভায়॥

অরণি, ১৩৫০

এ ক পৌ ষে র শী ত

দু-চোখ ছায় বাংলাদেশের মাটি
নদী ও খাল খামার তেপান্তর
পৌষমাসে বাঁধি সোনার আঁটি
অনেক পরব, দেশ যে উর্বর।

তবুও কোন্ মরিয়া পথভুলে
এসেছি সব কলকাতার পথে?
কোথা সমাজ? প্রাণ শিকেয় তুলে
ছুটছে লোক আপন ধন্ধায়

নানান্ রীতি, নানা রকম রথে
ঘরের কাজে আপিস ঘরে কেউ।

রূপার টানে সকাল-সন্ধ্যায়
মজুতদারে চোরা বাজারে ঢেউ।

লঙরখানার শান-বাঁধানো ভিড়ে
দেখি রে ভাই কলকাতার কেতা,
রাজা উধাও টাঁকশালের চিড়ে,
কোথায় লিগ মহাসভার নেতা!

লঙরখানায় উলঙ্গ সব ছেলে
ভাঙা ঘরের নোঙর-ছেঁড়া মেয়ে
দোকানঘরের কাচের বাহার ফেলে
সভ্য দেশের ধারার মুখে চেয়ে

থাকে যে, তা অনেক দিনের ফল,
অনেক কালের অনেক সভ্যতায়
মাটির মানুষ উগারে হলাহল
কোন্ অমৃতের কী সম্ভাব্যতায়?

সোনার দেশ, গরম হাওয়ায় মাটি
আকাশে তোলে মানুষ দুই বাহু,
নদীর মায়া ঘন সবুজ পাটি
বিছাই ঘরে, অনেক কাল-রাহু

অনেক কেতু আদিম কাল থেকে
দেবদেবী ও ভূতপেরেতের নামে,
বেদবেদান্তে অনেক ছলায় ঢেকে
ডাইনে মারী, দুর্ভিক্ষ বামে

অনেক কাল বৃথায় ছিল চেপে!
অজেয় প্রাণ সজল বাংলায়
চোর ডাকাতে যতই ছোটে খেপে,
সোনার মাটি মানুষকে সামলায়।

আমার মাটি সোনালি সমতলে,
ফিরেছি গাঁয়ে, চষি আপন মাটি,
বিশ্ব ছেয়ে প্রাণের আগুন জ্বলে,
ফসল বেঁধে বাঁধি প্রাণের ঘাঁটি॥

অরুণ মিত্র

ম র যা ত্রা

ধ্যানী বৃক্ষের ছায়া হ'টে গেল—
তেপান্তরের নৃশংস তেজ নীল বিদ্যুৎ—
স্পর্শের মার দিয়েছে শরীরে,
মরযাত্রায় সহিষ্ণু পিঠ হরধনু-ভাঙা,
ললাটপটের লেখা চৌচির, ভারতবর্ষ।

কালের গরজ ক্রূরবিভঙ্গ—
গণ্ডুষে-ধরা সফরি ভদ্র জীবনকে খোঁজে,
ব্যঙ্গে অকালমরণ সাগরে মন্থন তোলে ;
দেশবিদেশের কথকেরা দেখি
গলা-জড়াজড়ি, করুণ গল্পে অশ্রুসজল ;
চাঁদোয়া ঢাকা সে-আসর ছাড়াই পাগলা ঝোরার
অশান্ত টানে।

আদি গঙ্গায় পাড়ি দিয়ে কোন্
স্তূপ গড়ি? তার শিখরে কেতন উড়বে কখন?
ভস্মলোচন উপসংহারে
দাঁড়ি টেনে দেবে অমরমুষ্টি, ভারতবর্ষ?

জুয়াড়ীর দানে দুর্ভিক্ষের
উপহার গাঁথা মুণ্ডমালায়,
কূপমণ্ডূক লালসায় চিতাসজ্জার ঘটা,
অস্তাচলের নিষ্ঠুর ছোপ
রাঙায় কুটির রাঙায় খামার,
ঊর্ধ্বমুখের যুগ্ম কোটরে
স্থির দৃষ্টির ছুরিকাফলক, গগনস্পর্ধী
সন্ধানী আলো।

দামী কঙ্কালে পথ বাঁধালাম
জনসঙ্গীর অবিনশ্বর এই মূল্যের
পরিশোধ চাই,
ইতরজনের জিজ্ঞাসা জমে.

শেষ রক্ষার সমস্ত ভার তুলে দিয়ে ছেলে—
ভুলোনো ছড়ার মুখস্থ গানে
নেই তার কোনো উত্তর নেই।
করাল প্রাচীরে সম্মুখ রেখা
ছিন্ন এখনো, ভারতবর্ষ।

এ বা র

কঙ্কালমুঠি বাড়াও।
নির্বোধ দ্বিধা-দাবানলে দ্যাখো
অরণ্য যায় পুড়ে।
পাতা-ঝরা গান নেই আর পথ জুড়ে।
চোখের মণিতে সে-মরীচিকার ছায়া
মোছেনি কাঁকর বিঁধে?
কুহকী সূর্য বিকল নভশ্চর ;
এতদিনকার বিষণ্ণ হাসি
এবার অবান্তর।
হাড়ের ভেল্কি লাগুক বিসংবাদে।

জ ঠ র

আমরা পৌঁছেছি এসে নানা দিক থেকে
প্রখর প্রান্তের কাছে।
বিবিধ জল্পনা ক্ষান্ত ক'রে
ক্লান্ত চোখে আশা জ্বেলে
এগিয়ে এলাম এতদূর।
এখন সূচ্যগ্র লক্ষ্যে আমরা সকলে হব স্থির।
প্রাচীন বণিক ফেরে অন্তিম দাপটে
ঘরে ঘরে,
অন্য সদাগর

সশস্ত্র তাগিদ দেয় দ্বারে,
মাঝখানে ছিনিমিনি অন্ন গেল উড়ে
উপোসী গ্রাসের আগে।

এ নিরন্ন রাজ্যের সীমায়
দুর্জয় মিলনে মরি বাঁচি।
ভুখমিছিলের সামনে শুধু
সূচ্যগ্র লক্ষ্যের বিঁধ।

আমাদের ইতিহাসে চিহ্ন দিক
ক্ষুধিত জঠর।

জনযুদ্ধ, ১৩৫০

বনফুল

সো না টা

অস্তিত্বের পাঁজরে লেগেছে ঘা।
নিরবলম্ব আত্মারামেরা
তবু ছাড়বে না
বাঁধা-বুলি কপচানো।

চূর্ণ আয়নার সহস্র কুচিতে
একই মুখ দেখি সহস্রায়িত হ'ল—
'গেলাম, মলাম দ্বার খোলো দ্বার খোলো'
আর্ত্ত ক্ষুধিত শানিত গজল
আসমুদ্র হিমাচল
গাইছে আব্রাহ্মণ মুচিতে—
কৃষ্ণ বিষ্ণু রাম শ্যাম—নিশ্চিহ্ন আরামে।

তাল কাটছে না
স্বয়ং বেতাল ডুগি বাজাচ্ছেন যদিও।

মন্দ নয় এ সময় গ্রাম-নাম-সংকীর্তন
মশার কামড়, পচাপুকুর, ঘেঁটুবন
বন্ধকী জমি, ভাঙা হাল, মরা মন
রোগা গরুর ল্যাজ ধরে আউষ আমনের স্বপন
মন্দ লাগবে না নেহাত।
গজলের পর কীর্ত্তন উচিত জমা।
জমলেও কিন্তু খরচ
খচ খচ
তবু জমুক—আহা, জমুক।

জমেই আছে।
চোখে ছানি, সর্বাঙ্গে খোস
জরাজীর্ণ দেদো খোলস,
গায়ে আত্মসম্মানের ছেঁড়া কাঁথা,
আশে পাশে গোবর, কেলে হাঁড়ি, তোবড়ানো হাতা
ভাঙা তক্তাপোশ
নেই কি?
গ্রাম-বুড়ি বিড় বিড় করে কি আওড়াচ্ছেও যেন!

হয়তো রূপকথা—হয়তো প্রলাপ
হয়তো অভিশাপ,
হয়তো বৈদিক মন্ত্র,
মারণ তন্ত্র হয়তো,
কিম্বা প্রলয়ঙ্কর যন্ত্রের স্বপ্ন-ছড়া কোনও
কিম্বা...............
হয়তো...............
ফুটকি ফুটকি ফুটকি এবং ফুটকি।

তবু আসল কথা হচ্ছে-হেঁ হেঁ—
আমরা আছি এখনও ইশ্বরেচ্ছায়।
ভালই আছি
এবং আছে কোলাকুলি, মিষ্টিমুখ
প্রণাম, আশীর্বাদ,
খাম, পোস্টকার্ড
গদ্য পদ্য।
দন্তসার হাসিও ফুটছে কঙ্কালদের মুখে—
বাহবা কি বাহবা!

ফুটবে বই কি!
সাবাস সাবাস—শতং জিউ।
মড়া, কিউ,
"বাবারে বাবারে গেলাম মলাম"
টেক্কা, গোলাম
আসুক যাক বা থাক
আমরা যতক্ষণ আছি
বলবই কেয়াবাত, কেয়াবাত।

শনিবারের চিঠি, ১৩৫০

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

সুন্দরের অন্তর্ধান

যে রূপে জীবন ভরি' ভুলালে নয়ন,
যে অমৃতে পূর্ণ করি রাখিয়াছ মন,—
সে রূপ কোথায় তব লুকালে সুন্দর
এ সন্ধ্যায়? তোমরাও কি যৌবনের পর
জরা আসে, মরণের আতঙ্ক মাখিয়া
কুৎসিতের আবরণে সৌন্দর্য্য ঢাকিয়া?

সুন্দরের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী পদ্মাবতী
কোন দুঃখে, কার শাপে সাজিল জরতী?
অথবা আমারই ভুল! অভিশপ্ত প্রাণ
চির সুন্দরের বুঝি হারাল সন্ধান,
সুকৃতির অন্তে যেন! গঙ্গাবক্ষে তাই,
সাহারার মরু-অস্থি দেখিবারে পাই!

বায়ু আজ বিষদিগ্ধ; সুনীল আকাশ
মৃত্যুশরে মূর্চ্ছাহত; কুসুম সুবাস
গন্ধকের গন্ধে ভরা; হরিৎ কান্তার
হৃত-শোভা; নীলসিন্ধু পরে লৌহ-হার!
ধরার সৌন্দর্য্যসার মানবের মুখ
দুশ্চিন্তায় ক্লিষ্ট যেন প্রতিমূর্ত্ত দুখ!

যৌবন কোথায় গেল? বার্ধক্যে জরায়
কে দিল আচ্ছন্ন করি' আজি এ ধরায়?
পথে পথে গৃহহীন ভুখারী ভিখারী
মরণের নাভিশ্বাস টানে সারি-সারি
কিম্বা একা নিঃসহায়! দুর্বল দু'পায়
উঠিয়া দাঁড়ায়, তারও নাহিক উপায়!

সহজ আনন্দ, যাহা চিহ্ন জীবনের,
আজি তা কল্পনা-কথা বিস্মৃত দিনের!
হায়রে সুন্দর, যার করেছি আরতি
সুদীর্ঘ জীবন ভরি,—এই তার গতি!
চীৎকার চৌদিকে শিবা, অদূরে শ্মশান,
আকাশে গর্জিয়া ফিরে প্রলয় বিষাণ!

ভারতবর্ষ, ১৩৫১

সুকান্ত ভট্টাচার্য

শ ত্রু এ ক

এদেশ বিপন্ন আজ; জানি আজ নিরন্ন জীবন—
মৃত্যুরা প্রত্যহ সঙ্গী, নিয়ত শত্রুর আক্রমণ
রক্তের আল্পনা আঁকে, কানে বাজে আর্তনাদ সুর।
তবুও সদৃঢ় আমি, আমি এক ক্ষুধিত মজুর।
আমার সম্মুখে আজ এক শত্রুঃ এক লাল পথ,
শত্রুর আঘাত আর বুভুক্ষায় উদ্দীপ্ত শপথ।
কঠিন প্রতিজ্ঞাস্তব্ধ আমাদের দৃপ্ত কারখানায়,
প্রত্যেক নির্বাক যন্ত্র প্রতিরোধ সংকল্প জানায়।
আমার হাতে স্পর্শে প্রতিদিন যন্ত্রের গর্জন
স্মরণ করায় পণ; অবসাদ দিই বিসর্জন।
বিক্ষুব্ধ যন্ত্রের বুকে প্রতিদিন যে যুদ্ধ ঘোষণা,
সে যুদ্ধ আমার যুদ্ধ, তারই পথে স্তব্ধ দিন গোনা।
অদূর দিগন্তে আসে ক্ষিপ্র দিন, জয়োন্মত্ত পাখা-
আমার দৃষ্টিতে লাল প্রতিবিম্ব মুক্তির পতাকা।
আমার বেগান্ধ হাত, অবিরাম যন্ত্রের প্রসব
প্রচুর প্রচুর সৃষ্টি, শেষ বজ্র সৃষ্টির উৎসব।

র বী ন্দ্র না থে র প্র তি

এখনো আমার মনে তোমার উজ্জ্বল উপস্থিতি,
প্রত্যেক নিভৃত ক্ষণে মত্ততা ছড়ায় যথারীতি,
এখনো তোমার গানে সহসা উদ্বেল হয়ে উঠি,
নির্ভয়ে উপেক্ষা করি জঠরের নিঃশব্দ ভ্রূকুটি।
এখনো প্রাণের স্তরে স্তরে,
তোমার দানের মাটি সোনার ফসল তুলে ধরে।
এখনো স্বগত ভাবাবেগে,
মনের গভীর অন্ধকারে তোমার সৃষ্টিরা থাকে জেগে।
তবুও ক্ষুধিত দিন ক্রমশ সাম্রাজ্য গড়ে তোলে,
গোপনে লাঞ্ছিত হই হানাদারী মৃত্যুর কবলে ;
যদিও রক্তাক্ত দিন, তবু দৃপ্ত তোমার সৃষ্টিকে
এখনো প্রতিষ্ঠা করি আমার মনের দিকে দিকে।

তবুও নিশ্চিত উপবাস
আমার মনের প্রান্তে নিয়ত ছড়ায় দীর্ঘশ্বাস—
আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি,
প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।
আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়,
আমার বিনিদ্র রাতে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়,
আমার রোমাঞ্চ লাগে অযথা নিষ্ঠুর রক্তপাতে,
আমার বিস্ময় জাগে নিষ্ঠুর শৃঙ্খল দুই হাতে।

তাই আজ আমারো বিশ্বাস,
"শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।"
তাই আমি চেয়ে দেখি প্রতিজ্ঞা প্রস্তুত ঘরে ঘরে,
দানবের সাথে আজ সংগ্রামের তরে॥

অরণি, ১৩৫০

বো ধ ন

হে মহামানব, একবার এস ফিরে
শুধু একবার চোখ মেলো এই গ্রাম নগরের ভিড়ে,
এখানে মৃত্যু হানা দেয় বারবার ;
লোকচক্ষুর আড়ালে এখানে জমেছে অন্ধকার।
এই যে আকাশ, দিগন্ত, মাঠ, স্বপ্নে সবুজ মাটি
নীরবে মৃত্যু গেড়েছে এখানে ঘাঁটি ;
কোথাও নেই কো পার
মারী ও মড়ক, মন্বন্তর, ঘন ঘন বন্যার
আঘাতে আঘাতে ছিন্নভিন্ন ভাঙা নৌকার পাল,
এখানে চরম দুঃখ কেটেছে সর্বনাশের খাল,
ভাঙা ঘর, ফাঁকা ভিটেতে জমেছে নির্জনতার কালো,
হে মহামানব, এখানে শুকনো পাতায় আগুন জ্বালো।

ব্যাহত জীবনযাত্রা, চুপি চুপি কান্না বও বুকে,
হে নীড়-বিহারী সঙ্গী। আজ শুধু মনে মনে ধুঁকে
ভেবেছ সংসারসিন্ধু কোনোমতে হয়ে যাবে পার
পায়ে পায়ে বাধা ঠেলে। তবু আজো বিস্ময় আমার—
ধূর্ত, প্রবঞ্চক যারা কেড়েছে মুখের শেষ গ্রাস
তাদের করেছ ক্ষমা, ডেকেছ নিজের সর্বনাশ।

তোমার ক্ষেতের শস্য
চুরি ক'রে যারা গুপ্তকক্ষতে জমায়
তাদেরই দু'পায়ে প্রাণ ঢেলে দিলে দুঃসহ ক্ষমায় ;
লোভের পাপের দুর্গ গম্বুজ ও প্রাসাদে মিনারে
তুমি যে পেতেছ হাত; আজ মাথা ঠুকে বারে বারে
অভিশাপ দাও যদি, বারংবার হবে তা নিষ্ফল
তোমার অন্যায়ে জেনো এ অন্যায় হয়েছে প্রবল
তুমি তো প্রহর গোনো,
তারা মুদ্রা গোনে কোটি কোটি,
তাদের ভাণ্ডার পূর্ণ ; শূন্য মাঠে কঙ্কাল করোটি
তোমাকে বিদ্রুপ করে, হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকে—
কুজ্ঝটি তোমার চোখে, তুমি ঘুরে ফেরো দুর্বিপাকে।

পৃথিবী উদাস, শোনো হে দুনিয়াদার!
সামনে দাঁড়িয়ে মৃত্যু-কালো পাহাড়
দগ্ধ হৃদয়ে যদিও ফেরাও ঘাড়
সামনে পেছনে কোথাও পাবে না পার ঃ
কি করে খুলবে মৃত্যু ঠেকানো দ্বার—
এই মুহূর্তে জবাব দেবে কি তার?

লক্ষ লক্ষ প্রাণের দাম
অনেক দিয়েছি; উজাড় গ্রাম।
সুদ ও আসলে আজকে তাই
যুদ্ধ শেষের প্রাপ্য চাই।

কৃপণ পৃথিবী, লোভের অস্ত্র
নিয়ে কেড়ে নেয় অন্নবস্ত্র,
লোলুপ রসনা মেলা পৃথিবীতে
বাড়াও ও-হাত তাকে ছিঁড়ে নিতে।

লোভের মাথায় পদাঘাত হানো—
আনো, রক্তের ভাগীরথী আনো।
দৈত্যরাজের যত অনুচর
মৃত্যুর ফাঁদ পাতে পর পর ;
মেলো চোখ আজ, ভাঙো সে ফাঁদ—
হাঁকো দিকে দিকে সিংহনাদ।
তোমার ফসল, তোমার মাটি
তাদের জীয়ন ও মরণকাঠি

তোমার চেতনা চালিত হাতে—
এখনও কাঁপবে আশঙ্কাতে?
স্বদেশপ্রেমের ব্যাঙ্গমা পাখি
মারণমন্ত্র বলে, শোনো তা কি?
এখনো কি তুমি আমি স্বতন্ত্র?
করো আবৃত্তি, হাঁকো সে মন্ত্রঃ

শোন্ রে মালিক, শোন্ রে মজুতদার!
তোদের প্রাসাদে জমা হল কত মৃত মানুষের হাড়—
হিসাব কি দিবি তার?

প্রিয়াকে আমার কেড়েছিস তোরা,
ভেঙেছিস ঘরবাড়ি,
সে কথা কি আমি জীবনে মরণে
কখনো ভুলতে পারি?

আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই
স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের
চিতা আমি তুলবই।
শোন্ রে মজুতদার,
ফসল ফলানো মাটিতে রোপণ
করব তোকে এবার।
তারপর বহুশত যুগ পরে
ভবিষ্যতে কোনো যাদুঘরে
নৃতত্ত্ববিদ্ হয়রান হয়ে মুছবে কপাল তার,
মজুতদার ও মানুষের হাড়ে মিল খুঁজে পাওয়া ভার।
তেরোশো সালের মধ্যবর্তী মালিক, মজুতদার
মানুষ ছিল কি? জবাব মেলে না তার।

আজ আর বিমূঢ় আস্ফালন নয়,
দিগন্তে প্রত্যাসন্ন সর্বনাশের ঝড় ;
আজকের নৈঃশব্দ্য হোক যুদ্ধারম্ভের স্বীকৃতি।
দু'হাতে বাজাও প্রতিশোধের উন্মত্ত দামামা,
প্রার্থনা করো ঃ

হে জীবন, হে যুগ-সন্ধিকালের চেতনা—
আজকে শক্তি দাও, যুগযুগ বাঞ্ছিত দুর্দমনীয় শক্তি,
প্রাণে আর মনে দাও শীতের শেষের
তুষার গলানো উত্তাপ।

টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছেঁড়ো তোমার
অন্যায় আর ভীরুতার কলঙ্কিত কাহিনী।
শোষক আর শাসকের নিষ্ঠুর একতার বিরুদ্ধে
একত্রিত হোক আমাদের সংহতি।

তা যদি না হয়, মাথার উপরে ভয়ংকর
বিপদ নামুক, ঝড়ে বন্যায় ভাঙুক ঘর ;
তা যদি না হয় বুঝব তুমিতো মানুষ নও—
গোপনে গোপনে দেশদ্রোহীর পতাকা বও।
ভারতবর্ষ মাটি দেয়নিকো, দেয়নি জল
দেয়নি তোমার মুখেতে অন্ন, বাহুতে বল
পূর্বপুরুষ অনুপস্থিত রক্তে, তাই
ভারতবর্ষে আজকে তোমার নেই কো ঠাঁই॥

ফ স লে র ডা ক ঃ ১ ৩ ৫ ১

কাস্তে দাও আমার এ হাতে—
সোনালী সমুদ্র সামনে, ঝাঁপ দেব তাতে।

শক্তির উন্মুখ হাওয়া আমার পেশীতে
স্নায়ুতে স্নায়ুতে দেখি চেতনার বিদ্যুৎ বিকাশ ঃ
দু'পায়ে অস্থির আজ বলিষ্ঠ কদম ;
কাস্তে দাও আমার এ হাতে।

দু' চোখে আমার আজ বিচ্ছুরিত মাঠের আগুন,
নিঃশব্দে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে তরঙ্গিত প্রাণের জোয়ার
মৌসুমী হাওয়ায় আসে জীবনের ডাক ঃ
শহরের চুল্লী ঘিরে পতঙ্গের কানে।

বহুদিন উপবাসী নিঃস্ব জনপদে,
মাঠে মাঠে আমাদের ছড়ানো সম্পদ
কাস্তে দাও আমার এ হাতে।
মনে আছে একদিন তোমাদের ঘরে
নবান্ন উজাড় করে পাঠিয়েছি সোনার বছরে,
নির্ভাবনার হাসি ছড়িয়েছি মুখে
তৃপ্তির প্রগাঢ় চিহ্ন এনেছি সম্মুখে,
সেদিনের অলক্ষ্য সেবার বিনিময়ে
আজ শুধু কাস্তে দাও আমার এ হাতে।

আমার পুরনো কাস্তে পুড়ে গেছে ক্ষুধার আগুনে,
তাই দাও দীপ্ত কাস্তে চৈতন্য-প্রখর—
যে কাস্তে ঝলসাবে নিত্য উগ্র দেশপ্রেমে
যে কাস্তে শত্রুর কাছে দেখা দেবে অত্যন্ত ধারালো।

জানি আমি মৃত্যু আজ ঘুরে যায় তোমাদেরও দ্বারে
দুর্ভিক্ষ ফেলেছে ছায়া তোমাদের দৈনিক ভাণ্ডারে ;
তোমাদের বাঁচানোর প্রতিজ্ঞা আমার,
শুধু আজ কাস্তে দাও আমার এ হাতে।

পরাস্ত অনেক চাষী ; ক্ষিপ্রগতি নিঃশব্দ মরণ—
জ্বলন্ত মৃত্যুর হাতে দেখা গেল বুভুক্ষুর আত্মসমর্পণ,
তাদের ফসল প'ড়ে, দৃষ্টি জ্বলে সুদূরসন্ধানী
তাদের ক্ষেতের হাওয়া চুপিচুপি করে কানাকানি—
আমাকেই কাস্তে নিতে হবে।
নিয়ত আমার কানে গুঞ্জরিত ক্ষুধার যন্ত্রণা,
উদ্বেলিত হাওয়া আনে মাঠের সে উচ্ছ্বসিত ডাক,
সুস্পষ্ট আমার কাছে জীবনের সুতীব্র সংকেত ঃ
তাই আজ একবার কাস্তে দাও আমার এ হাতে॥

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

আ মা দে র গা ন

লজ্জা কিছু নাই।
বেদনার বিজ্ঞপ্তিকে অবহেলা করি
মোরা গান ধরি।
শঙ্কা, তাই
চূর্ণশির, বিকৃত অসুর,
লোলজিহ্বা, রণক্ষেত্রে নিহত। এ সুর
নির্ভীক সৈন্যের। পায়ে পায়ে দলে যায়
ধ্বংসের প্রান্তর যারা,
অমাবস্যা-ঝড়ে যারা নিত্য দিশাহারা।
নিগ্রহ অনেক।
বন্যা, মহামারী আর বোমা বজ্রে
দীর্ণ ভিন্ন জনতার মন, শুধু
দাঁড়ায় ক্ষণেক,
আমাদেরই গানের আড়ালে।
প্রাণীতে শ্রেণীতে দেশে, প্রবল ঘর্ষণে
বহ্নিশিখা জ্বালে।
ইতিহাস নাড়ে বৃদ্ধমাথা,
নির্বিকার-কেবলি ঘুরায়
বিশ্বম্ভর যাঁতা।
মৃত্যুর ফসলে ভরে কালের ভাণ্ডার।
ছিন্নশির, পিষ্টদেহ, ধূলিসাৎ অট্টালিকা, আর
মৃত-মাতা শিশুদের ক্ষুদ্র শীর্ণ মুঠি,
মৃত বৎসা মাতার ভ্রূকুটি।
পাখিত্যক্ত শূন্য নীড় করে হাহাকার,
নিরঙ্কুশ নীল এই আকাশ কাঁপায়,
নিষ্পত্র কঙ্কালসার গাছের শাখায়।
তবু গান করি,
জনতার নিগৃহীত প্রাণের মেলায়।
ডঙ্কা বাজে তালে তালে,
শঙ্কা চূর্ণ করি।
তবু গান করি॥

শারদীয় যুগান্তর, ১৩৫০

মনীন্দ্র রায়

অ নু ভ ব

ধূলিমাখা দেহ, চাষের দিন
মনে পড়ে আহা সে যেন স্বপ্নে শোনা!
আসেনি যেন এ জীবনে আমার ধানপাকা আশ্বিন,
খরা ঝরা মাঠে বৃষ্টির দিন গোনা ঃ
সে যেন গল্প। আর
যা ছিলো সুদূর রূপকথা সেই বিরাট ক'লকাতার
পথে যে দাঁড়িয়ে ভীরু গ্রামবাসী,
মহেশের এক অখ্যাত চাষী,
কঠিন সত্য বুঝি সে নিয়ত পেটে;
হঠাৎ কখনো সদয় ফ্যানে যা দেহের চাহিদা মেটে।
আউশ ডুবেছে বর্ষায়, গেল আমন ঝড়ে ;
বিচালিবিহীন শীর্ণ বলদ কসাই কিনেছে জলের দামে;
ছেলেটা শান্ত ঃ চুপচাপ মরে
ভাবনা থামে!
বউয়ের শরম রাখে না গ্রাম্য-ঘোমটায়, আসি শহরে হেঁটে ঃ
কত কোটিপতি রয়েছে, পাবই দু'মুঠো পেটে!

বৃষ্টিভেজা গুমোট দিন।
ঘুরি বেপরোয়া, সঙ্গিহীন।
একদা সকালে লোকারণ্যের ভিড়ে
সতীর স্বর্গলাভের পুণ্যে.বন্ধন গেল ছিঁড়ে।
সাবেক কালের সুদিনে দৈব সন্ন্যাসী হ'লে খাসা
ছা-পোষা লোকের ঘাড়ে চেপে যেত ভবসমুদ্রে·ভাসা।
আপাতত শুধু সারা ক'লকাতা হেঁটে
খাদ্যের নানা আয়োজন আর প্রহসন ভরি পেটে।
এখানে দাঁড়িয়ে তাই
দুনিয়া অন্ধকার।
অতীতের দিন বিস্বাদ লাগে,
সান্ত্বনা লেশ নাই।
তবু যে কেমন ঘুরে ফিরে এক দূর আশা মনে জাগে ঃ

এত হানাহানি, উপবাস আর চরম বঞ্চনার
কোথাও আছেই শেষ,
হয়তো কখনো কোনদিন যারা বেঁচে যাবে, উদ্দেশ
পাবে সে দিনের, গেলে দুর্যোগ কেটে।
হয়তো তখন তারা পাবে তাজা অন্নের দানা।
স্বাধীন সুস্থ পেটে।

দিগন্ত, ১৩৫০

দিনেশ দাস

প ঞ্চা শে র ম ন্ব ন্ত র

দীর্ঘশ্বাসের মত আসে
চোখের জলের মত এরা মুছে যায়,
এরা আসে এরা যায়—
মাটির সবুজ শিরা বেদনায় হয়েছে কি নীল?
পৃথিবী কি অশ্রুতে হয়েছে ফেনিল?

এরা আসে
ব্যথার বাষ্পের মত ফুলে ওঠে ঈশান-আকাশে,
আসে কালো কুয়াসার মত
ম্লান, অবনত,
তবু বারেবারে
চিরে যায়, ছিড়ে যায় শাণিত সূর্যের ক্ষুরধারে।

দীর্ঘশ্বাসের মত আসে,
চোখের জলের মত এরা মুছে যায়,
শিশিরের মত মোছে ঘাসেব শয্যায়,
মাটির শ্যামল প্রাণ বেদনায় হয়েছে কঠিন!
পৃথিবী কেঁদেছে কোনদিন?

বন্যার হাওয়ার মত এরা হা-হা করে
দুর্ভিক্ষের ঝড়ে,
আসে মন্বন্তরে
মারী নিয়ে, মৃত্যু নিয়ে হাড়ের ভিতরে;
তবু এরা আসে—
এগারোশ ছিয়াত্তরে—তেরশো পঞ্চাশে—
এরা আসে, আসে।

দিগন্ত, ১৩৫০

গ্লা নি

বেঁচে আছি আমি,
এর চেয়ে নেই লজ্জা নেই বড় গ্লানি।
আমার চতুর্দিকে রাত্রিদিন হাহাকার
মৃত আর মুমূর্ষুর ভিড়,
তার মাঝে প্রাণের কলঙ্ক নিয়ে ব'হে চলি আদিম শরীর;
বেঁচে আছি আমি,
এর চেয়ে নেই লজ্জা নেই বড় গ্লানি।

একদিন এই আমি
একহাতের বাঘের টুঁটি অন্যহাতে হাঙরের দাঁতে
বারবার তীক্ষ্ণ বিষ-বর্শার আঘাতে
জীবনের করেছি ঘোষণা, মৃত্যুকে উজোড়।
এই আমি বঙ্গোপসাগর তীরে
ছুঁড়েছি হাজার মুঠো বালির বছর—
চকচকে মুঠো মুঠো বালির জীবন-
কোথা সে সুন্দরবন?
সেই আমি সোঁদরবনের সন্তান
পথে পথে কেঁদে ঘুরি, কে কোথায় কর অন্নদান!
তবু বেঁচে আছি
নেই লজ্জা অপমান এর কাছাকাছি।

আমার দুঁপায়ে ঠেকে শত মৃতদেহ
তবু তো বহেছি প্রাণ নিঃসন্দেহে,
এদের অনেকে একদিন ঝরায়ে অনেক স্বেদজল
মাঠে মাঠে পুঁতে গেছে সোনার ফসল,
তাদের মুখের অন্ন মুখে তুলি আজকে যখন,
মনে করি প্রাণপণ
আমার কি প্রাণ আছে? যদি বেঁচে থাকি আমি—
এর চেয়ে নেই লজ্জা নেই বড় গ্লানি।

ডা স্ট বি ন

মানুষ এবং কুত্তাতে
আজ সকলে অন্ন চাটি একসাথে,
আজকে মহাদুর্দিনে
আমরা বৃথা খাদ্য খুঁজি ডাস্টবিনে।

এই যে খুনে সভ্যতা
অনেক জনের অন্ন মেরে কয়েক জনের ভব্যতা,
এগোয় নাকো পেছোয় নাকো অচল গতি ত্রিশঙ্কুর—
হোটেলখানার পাশেই এরা বানিয়ে চলে আঁস্তাকুঁড়।

আজ যে পথে আবর্জনার স্বৈরিতা,
মহাপ্রভু! বণিক-প্রভু! সবই তোমার তৈবি তা!
দেখছি ব'সে দূরবীণে,
তোমায় শেষে আসতে হবে তোমার গড়া ডাস্টবিনে।

দো ল না

আজকে ছোট দোলনাখানি দুলিয়ে দাও
ঘুমের চামর বুলিয়ে দাও
জীবনদোলা দুলিয়ে দাও।

নীল আকাশের নীলগুলি সব নিংড়ে আনো
নতুন মেঘের সজল কালো মন ভুলানো
নিংড়ে আনো,
হাজার কচি করুণ চোখে মেঘের কাজল বুলিয়ে দাও
ককিয়ে-ওঠা কান্নগুলি ভুলিয়ে দাও
আজকে ছোট দোলনাখানি দুলিয়ে দাও।

আজকে দেশের এ-প্রান্তরে
তেপান্তরে
হাজার শত দেব্‌তা-শিশু ককিয়ে মরে
অনাবৃত অনাদৃত
জীবন্মৃত স্তূপীকৃত।
আজকে পথে নীড়-হারানো
হাজার হাজার নতুন জীবন কুড়িয়ে আনো
কুড়িয়ে আনো,
হাজার কচি শুকনো চোখে মায়ার কাজল বুলিয়ে দাও,
কান্নাহাসির জীবনদোলা দুলিয়ে দাও।

ভু খ-মি ছি ল

এই আকাশ স্তব্ধ নীল।
কোনোখানেই
যুদ্ধ নেই
হেথা আকাশ রুক্ষ নীল
নিম্নে ভিড় ভ্রষ্টনীড় মৌনমূক ভুখ-মিছিল।

এখানে নেই টুকরো দূর-দিগন্তের
জলন্ত
এখানে নেই আগুন-ফুল সে বৃন্তের
ফলন্ত
হেথা আকাশ শুষ্ক নীল
নিম্নে ভিড় ভ্রষ্টনীড় মৌনমূক ভুখ-মিছিল।

কোনোখানেই
যুদ্ধ নেই
তবু হাওয়ায় কিসের সুর
আহত্র আর মুমূর্ষুর
বিষণ্ণ।
অন্ন নেই, পণ্য নেই বিপন্ন।
আকাশে দাগ কোথাও নেই কঙ্কালের কলঙ্কের
অসংখ্যের।

খোলো নয়ন হে অন্ধ,
এখানে আজ ঘোরে না সেই মহাসমর কবন্ধ?
এই দারুণ ক্রন্দনেই
যুদ্ধ নেই? যুদ্ধ নেই?
তবু আকাশ স্তব্ধ নীল-
নিম্নে ভিড় ভ্রষ্টনীড় মৌনমূক ভুখ-মিছিল।

সমর সেন

গৃ হ স্থ বি লা প

এক

যদিবা পাঠালে পৃথিবীতে
তবে কেন দিলে এত ব্যর্থতা ঠাকুর।
শুনেছি পঞ্জিকা মতে
শুভক্ষণে জন্ম অভাগার,
সে লগ্নে গৃধিনীমুখে বাজে নি অশুভ চিৎকার
কিংবা অদৃষ্টের ব্যঙ্গে
অতি ধূর্ত কাক সহসা কর্কশ ডাকে
ভাঙে নি কো জননীর প্রসব আবেশ।
সপ্তম সন্তান আমি;
কিন্তু সন্তানের জন্ম আর সর্বনাশ
সমার্থক তখনো হয় নি।

আমাদের বংশে
গ্রাম ছেড়ে পিতামহ প্রথম শহরে আসেন।
রক্তে তার কিছু ছিল নদীর উদ্দাম বেগ,
সাক্ষী তার ষোড়শ সন্তান!
গুজব আছে যে গৃহত্যাগকালে
দেবী তাঁকে স্বপ্নে করেছেন বরদান ঃ
দুধে ভাতে বাঁচিবেক তোমার সন্তান।
সুতরাং
সবুজ চশমা চোখে আমরণ ছিল,
সে সবুজ আদি ভিটের জমিজমার,
কিছু-বা আপন পৌরুষের।

দুই

এ কী ভিক্ষামূর্তি প্রভু?
ভদ্রভাবে দিন গুজরান অসম্ভব আজ।
কোঁচার পাটে ময়লা জমে,
টেরিও থাকে না ঠিক,
ষোড়শোপচার ব্যঞ্জন কমে।

রাত্রে স্বপ্নহীন ঘুমে
উদ্যত উৎকণ্ঠা জাগে মানসশিয়রে।
যে-জাদুতে কাগজ-হকার
গিয়েছে একদা লাটের মন্ত্রণাগার,
সে-জাদুতে আমরা বঞ্চিত।
ভেবে দেখো, কিছুদিন আগে
জ্বর থেকে উঠে অম্লক্লান্ত রুগী
পেয়েছে অন্তত পান্তা ভাত,
পাশে যার লালচে নুন,
মনোহার কাঁচালঙ্কা বঙ্কিম সবুজ।
আজ তাকে দেখি বেলা দ্বিপ্রহরে
ফ্যান খুঁজে ধোঁকে গৃহস্থের দুয়ারে-দুয়ারে
বিরাট নগরে।
একাগ্র ক্ষুধার জ্বালা
দেহ জীর্ণ করে চোখের অঙ্গারে জমে;
নীড় নেই, মারি দিগ্বিজয়ী,
স্ত্রী-কন্যা গিয়েছে অন্য পথে
নিরুদ্দেশ নরকে,
সবে ধন নীলমণি! কঠিন শরীর
ভেসেছে নদীর জলে।

তিন

কুকুর যখন নরভুক,
হেমন্ত সন্ধ্যায় মাঠে-বাটে শকুনের ধ্যান,
ন্যায়ধর্ম দেশান্তরী, শঠতার জয়,
পৃথিবীর এলোকেশী বেশ,

রক্তে কি তখনো বাজে পুরনো নদীর গান?
সুচন্দন বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ কখনো কি ধরে!
আমাদের শ্রেণী লবেজান,
শ্রোণীভারানত সুন্দরীর কালিদাসী সন্ধ্যা
আমাদের নয়,
নয় ওঠা-নামা প্রেমের তুফানে,

বন্ধ কঙ্কণঝংকার, চোখেতে কাজল।
রাত্তিরে গভীরে ঘুমে
ক্ষীণ সূত্রে বাঁধা খড়গের মতো
সর্বনাশ সমুদ্যত মাথার শিয়রে।

চার

অনেক ফিরেছি ধনীর পিছনে,
দরিদ্রে কেহ না সম্ভাষে।
বড়লোকে আস্থা নেই আর,
দেখেছি দেশের দুর্যোগে
কী উপায়ে কাঁচা টাকা ভাঁড়ু দত্ত করে।
মাঠে-মাঠে সোনার ধান
কোথায় ধান!
সোনা জমে তাদের ভাণ্ডারে।
শবগন্ধ অন্ধকারে
রাস্তায় কঙ্কাল যদি জমে
তারা বলে; সবি মায়ার ছলনা,
কে বাঁচে কে মরে কেউ জানে না,
হরিই চরম সান্ত্বনা।
ভবের ব্যাপারে তিনি ব্যাপারী,
খরনদীতে তিনি কাণ্ডারী,
আমরা অধম চালের ব্যাপারী,
দিনে রাতে সই কত লাঞ্ছনা!
ধান যদি ধরে রাখি লোকের গঞ্জনা,
মাল ছেড়ে দিলে হায় ক্ষতির যন্ত্রণা,
যোগেতে লাঞ্ছনা, ভোগেতে লাঞ্ছনা,
হরির চরণ সান্ত্বনা।
চাল চেপে রেখে শত্রুনাশ
তাঁরি তো মন্ত্রণা।

পাঁচ

অকাল মরণ শেষে এ কাল সমরে!
তোমাকে জানাই বন্ধু;
পথে বাধা পর্বত আকার,
ঘুণধরা আমাদের হাড়,

শ্রেণী ত্যাগে তবু কিছু
আশা আছে বাঁচবার।
যারা মাঠে খাটে,
উদ্দাম নদীতে জাল ফেলে
মাছ ধরে যারা আনে হাটে,
ধান জল বিদ্যুৎ কয়লা
আনে যারা নগরিয়া ঘরে ঘরে
সরায় ময়লা, দুধ দেয় যে গয়লা,
তাদের মিতালি খুঁজি।
তাদের জীবন কর্কশ কঠিন,
হয়ত মলিন
নিরক্ষর অতীতের জগদ্দল চাপে,
তবু তারা কালের সারথি,
তাদের দোস্তি, তাদের গতি
আমার পরমা যতি।

কবিতা, ১৩৫০

২ ২ শে জুন

১

গ্রাম ছেড়ে অন্য গ্রামে যাই
কঙ্কালে ভরেছে দেশ।
এ রোদে সোনার ধান পোড়ে
মনে নীলকান্ত মেঘ শেষ।
কড়া রোদ যেন শাদা জানোয়ার
দীর্ণ করে পৃথিবী আমার।

দেবতাকে গাল দিয়ে কলকাতায় ফিরি।

এখানে বিরাট ব্রিজ
আসন্ন কালের সংকেত মহিমায়
মরাদেশে জীবন্ত মানুষের মতো
উদ্যত।

সন্তর্পণে ব্রিজ পার হয়ে
রক্তবর্ণ গোধূলিতে, ক্লান্ত জিজ্ঞাসার মতো,
যেন চিরকালের কেরানী পদব্রজে
অন্ধকার গলির গহ্বরে ফিরি।
যন্ত্রের দাপটে আকাশ জাহাজ
ছিন্ন করে বায়ুস্তর, খর শব্দ শেষ হলে
কিছুক্ষণ পরে বাজে আতঙ্ক-ভঞ্জন সুর,
তারপর রেডিওতে পূরবীর সুর।
অবস্থা সঙিন বটে। রুদ্ধ রাত্রি। কিন্তু রুশ চীন দেশে
রাক্ষস নাকাল
দেখি লাল নীল সবুজ সকাল।
শৌখিন স্বস্তিতে
সত্তার গভীর নীলে কল্পনার পায়রা ওড়াই
যেন বাগানের অন্ধকারে নীল ফুলের রোশনাই।

২

দুকোটি ক্ষুধার অভিশাপ
সংহত বাঙলা দেশে।
চোরে চোরে মাসতুতো ভাই,
নিবিড় মিতালি মহাজন ও শকুনে।
দুর্দিন রপ্তানি কিছুদিন বন্ধ কর
এদেশে, হে দেব! ক্ষান্ত কর দাক্ষিণ্য দারুণ।
বিপুলা পৃথিবী! অন্য দেশে লেগেছে আগুন,
কালসিটে কালোমেঘ, সূর্যাস্তের রঙ যেন মানুষের খুন।
কিন্তু সেখানে আগ্নেয় স্ফুলিঙ্গে
ধূমায়িত অরণ্য প্রান্তরে বিদীর্ণ পাহাড়ে
গুপ্তস্তরে পলিমাটি জমে; দিগ্বিজয়ী সৈন্যদল,
দর্পহর বর্বর বাহিনীর সহজ সকাল আনে;
সেখানে ট্যাঙ্কের শব্দ স্তব্ধ হলে
বিধ্বস্ত মাটিতে আনে ট্রাক্টরের দিন
জোসেফ স্টালিন।

প্রেতলোকে যারা আনে প্রাণের স্বাক্ষর,
কর্ম আর চিন্তা যাদের জীবনে হরিহর,
অমর নমস্য তারা। ঈগল চক্ষুতে

তারা দেখে বিচ্ছিন্ন শহর গ্রাম, ধোঁয়াটে প্রান্তর,
আরো দেখে অবিচ্ছিন্ন জীবনের একসূত্র, ঘনিষ্ঠ প্রান্তর,
নারকীয় অন্ধকার পার হয়ে তারা আসে পাহাড় চূড়ায়;
লেনিন, স্টালিন, জুখভ্ ও গোর্কি,
তাদের আমরা চিনি। কিন্তু বুঝিনা তাকে,
দুধ ও তামাকে সমান আগ্রহ যার,
দু'নৌকার যাত্রী এই বাঙালী কবিকে
বুঝি না নিজেকে।

শিবরাম চক্রবর্তী

কা ল ক্র ম

সবচেয়ে আমার খারাপ লাগে এই যে
তোমার কোনো দুশ্চিন্তা নেই;
কিছুমাত্র তাড়া নেই কোনো কিছুতেই তোমার।
কত যুদ্ধ বিগ্রহ অশান্তি উপদ্রব—
কত হাহাকার মড়ক আর মন্বন্তর—
কত চক্র আর চক্রান্ত,
ফুলের মত যারা ফুটতে পারত—
হয়ত বা ফুটেছিল—
কত যে তাদের দলে দলে ঝ'রে পড়া—
অকাতরে ব্যর্থ হয়ে যাওয়া কত না।
কিন্তু তোমার কোন গরজ নেই গর্জন করে আসবার।
আমরা দুশ্চিন্তায় জড়ো জড়ো,
ক্ষুধাতৃষ্ণায় মরো মরো—
কিন্তু তুমি একটির পর একটি দল মেলে চলেছ
মহাজীবন-পদ্মের
নিজের মনে — আপনার লীলায়।
অফুরন্ত সময় তোমার হাতে, অনন্ত তোমার
অবকাশ—
তোমার হাতে চাকা ঘুরছে ধীর মন্থর গতিতে।
কিন্তু— কিন্তু কী তার ঘূর্ণাবেগ!
দেখতে না দেখতে উড়ে যাচ্ছে শতাব্দীরা—
মিলিয়ে যাচ্ছে সম্রাটদের মুকুট—
কত নক্ষত্রের আলো যাচ্ছে ফুরিয়ে—
আর তোমার হাতের মহাপদ্ম—
পৃথিবীর এই মানুষ—
মানুষের এই জীবন—
সম্পূর্ণ হয়ে উঠছে দলে দলে।
আর, এক জন্মে লক্ষ জন্ম যাপন করছি—
এক জীবনে অযুত জীবন—
এক মুহূর্তে সহস্র চেতনা—
পলকের পরমায়ুজীবী আমরা।

তোমার এই অফুরন্ত কালস্রোত—
বলো, এ কি আমারো সময়?
তোমার এই সীমাহীন পরিবেশ—
এ কি হতে পারে আমারো অবকাশ?
তুমিই জানো।

বঙ্গশ্রী, ১৩৫০

অ তি থি

সেদিন তো যেতে যেতে দেখলাম হায়,
দুর্গত এক
শুয়ে আছে লাটের বাড়ির কিনারায়।
অস্থিসার ভারতের অস্তিত্বের সীমান্ত বজায়
দুর্গত এক—
নারায়ণ, দরিদ্র বেজায়,
শুয়ে আছে শেষ নাগে অনন্ত শয্যায়।
(ধনী ও দালালে মিলে মেরে কি করেছে ওরে লাট?
জলে যেথা জল বাধে, সেরূপ প্রথায়,
তাই কি ঠেকেছে এসে শেষে সে লাটের মোহনায়?)
দুর্গত এক
লাট হয়ে শুয়ে আছে লাটের বাড়ির দরজায়।

আরো একজন, হয়তো বা অবিকল ওর মত এক
ছিল বুঝি ওখানে কোথায়।
(দুর্গতই, বিকল্পে, দূরগত বলা যায়।)

সাত সমুদ্রের পার হতে, বিচিত্র দেখ্
সেও তো এসেছে বুঝি একটু রুটির প্রত্যাশায়।

কে এল কাহার আমন্ত্রণে,
তাই ভাবি মনে।

শনিবারের চিঠি, ১৩৫০

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

চি র কু ট

শতকোটি প্রণামান্তে
হুজুরে নিবেদন এই—
মাপ করবেন খাজনা এ সন
ছিটেফোঁটাও ধান নেই।

মাঠেঘাটে কপাল ফাটে
দৃষ্টি চলে যত দূর
খাল শুক্‌নো, বিল শুক্‌নো
চোখের কোলে সমুদ্দুর।

হাত পাতবো কার কাছে কে
গাঁয়ে সবাব দশা এক
তিন সন্ধে উপোষ দিলাম
আজ খাচ্ছি বুনো শাক।

পরনে যা আছে তাতে
ঢাকা যায় না লজ্জা
ঘটি বাটি বেচেছি সব
আছে বলতে ছিলো যা।

এ দুর্দিনে পাওনা আদায়
বন্ধ রাখুন, মহারাজ
ভিটেতে হাত দেয় না যেন
পাইক ববকন্দাজ।

আমরা কয়েক হাজার প্রজা
বাস করি এ মৌজায়
সবাই মিলে পথ খুঁজছি
কেমন করে বাঁচা যায়।

পেট জ্বলছে, ক্ষেত জ্বলছে
হুজুর, জেনে রাখুন
খাজনা এবার মাপ না হলে
জ্ব'লে উঠবে আগুন।

এ ই আ শ্বি নে

পথের দুদিকে বাসা
বেঁধেছে কঙ্কাল;
গ্রাম করে খাঁ খাঁ—
উঠোনের এক কোণে
শোকাচ্ছন্ন পড়ে থাকে
ভগ্নদূত শাঁখা।

রক্তচোষা দিগ্বিজয়ে ফেরে—
বন্দরে বাজায় ডঙ্কা
চরাচর মৃত্যুজালে ঘেরে।

চোখ তার
অনুর্বর অন্ধকারে ঢাকা,
গায়ে তার শবগন্ধ,
পদতল চিতাভস্মে রাখা।

ঝড় এসে পাতা নাড়ে
বীজে লাগে টান,
উপবাসরুক্ষ হাড়ে
বজ্র পাতে কান;
উন্মত্ত বন্যার স্তম্ভ ফাঁপে,
রুষ্ট কৃষ্ণ মেঘে কাঁপে,
যেন কোনো কটাক্ষের স্খলিত বিদ্যুৎ!
দিকে দিকে ছুটে যায় দূত
জয়ের পতাকা হাতে,
মাটি পাতে সবুজ আসন,
দুহাতে পরায় সূর্য
জীবনের মাথায় মুকুট।

রোমাঞ্চিত মাঠে মাঠে
ফেটে পড়ে
আশ্বিনের আশ্চর্য সকাল।
পুলকিত অরণ্যের
মন্ত্রমুগ্ধ নীলাক্রান্ত পাখি
নিরুদ্দিষ্ট শূন্যে মেলে পাখা।

অবরুদ্ধ তরুশাখা
চঞ্চল হাওয়ায় মাথা কোটে;
দুরন্ত মনের ইচ্ছা
আরক্তিম ফুল হয়ে ফোটে।

মরাগাঙে কলোচ্ছ্বাসে
নেমে আসে অস্থির জোয়ার;
করাঘাতে খুলে যায়
জীবনের রুদ্ধ সিংহদ্বার।

দিন লেখে বিধিলিপি
আকাশের প্রশস্ত ললাটে,
আদিগন্ত চষে-ফেলা মাঠে
আগন্তুক অঙ্কুরিত পদচিহ্ন আঁকে।
অরণ্যের ডালে ডালে
বাজুবন্ধে বেঁধে দিয়ে পর্ণচূড় রাখী
আলাপে মুখর হয় পাখি।

পরাক্রান্ত শত্রু তবু
থাকে।
আঙুলে পরানো তার বাঘনখ
ভালবেসে সে যখন ডাকে;
পায়ে তার মৃত্যু বাঁধা;
লোভ তার বাঁধানো সড়ক।

ক্ষমা নেই—
শোকাকুল সন্ধ্যাকাশে মোছা
এয়োতির আরাধ্য সিঁদুর।
ক্ষমা নেই—
এ আশ্বিন স্মৃতিভারাতুর
কাঁধে কাঁধ সান্নিধ্যে দাঁড়াও
হাতে হাতে বজ্র হানো
ভূকম্পিত বিস্ফোরণে চাও—
শৃঙ্খলের কলঙ্কমোচন।

স্বা ক্ষ র

নির্মেঘ আকাশে এক রক্তাক্ত সমরে
অন্ধকারে ধুঁকে ধুঁকে মরে।
এখনো ওঠেনি সূর্য, রুক্ষ কাক ডাকে,
পথের ঘুমন্ত স্রোত ওঠে।
সঙ্গীচ্যুত পড়ে থাকে
জীবন স্পন্দনশূন্য নিশ্চল শরীর।
চোখে তীব্র অভিযোগ,
ভিক্ষাপাত্রে দুটি হাত স্থির;
ঠোঁটে তার বিস্ফারিত ক্ষুধিত আত্মার
কঠিন দন্তুর অভিশাপ।

শোকাশ্রু ঝরে না কারো,
উচ্চারিত হয় না বিলাপ;
পাশে শুধু অট্টহাসে
লোভাতুর জন্তুর ভ্রূকুটি,
বাৎসল্য নিহত, প্রেম পরাভূত-
দন্ত কুটি কুটি
ছিন্নভিন্ন উদ্বাস্তু সংসার;
মর্মন্তুদ এ দগ্ধ মেদিনী।

মনে হয় চিনি
উৎকর্ণ ফসল বার বার
শুনেছিল ওর পদধ্বনি;
চোখে ছিল আগন্তুক দিনের উচ্ছ্বাস,
হাতের মুঠোয় ছিল ঐশ্বর্যের খনি
বুকজোড়া বিপুল বিশ্বাস-
ওর কাছে ঋণগ্রস্ত আমার ধমনী।

শূন্য পেটে নেমে আসে
ছলে বলে ছায়াচ্ছন্ন রাত্রির শৃঙ্খল,
চেতনা হয়েছে ক্ষীণ, সঙ্কল্প দুর্বল;
দরদীর ছদ্মবেশ ধ'রে
শহরে বন্দরে গণ্ডগ্রামে গঞ্জে ঘোরে
শত্রুর দালাল,
এক হাতে বন্ধ রাখে অন্ধকার ঘরে
লক্ষ মণ চাল;
অন্য হাতে অগ্নিগর্ভ প্ররোচনা।

ঐ আসে! ঐ আসে!
অরক্ষিত রথচক্র,
স্খলিত বজ্রের নীচে
বিনা মেঘে দিগ্‌ভ্রান্ত দেশগর্ব কাঁপে।
হত্যাকারী হাসে,
অস্থির আঙুলে দিন গুণে চলে,
পথের দূরত্ব হাড়কাঠি দিয়ে মাপে।

দেশ তবু ম'রেও মরে না;
দশ হাতে ছোঁড়া তার মৃত্যুবাণে
নিয়তি নিহত।
হাতে হাত বেঁধে তুলে আনে
মুক্ত আঙিনায় বন্ধ ঘরের ফসল।
পথে নিরন্নের ত্রাণে সেবাব্রত,
প্রতিরোধ পরিখা প্রাকারে।

জীবন ছড়ায় মাঠে বীজমন্ত্র,
অসংখ্য লাঙল
নবান্নকে ডাকে।
যদিও সম্মুখে ঝড়,
ভয়ে কণ্টকিত বিপর্যয়,
তবু জানি আমাদের জয়,
অমর প্রতিজ্ঞাপত্রে রাখি দশ হাতের স্বাক্ষর।

স্বা গ ত

গ্রাম উঠে গিয়েছে শহরে—
শূন্য ঘর, শূন্য গোলা,
ধান-বোনা জমি আছে পড়ে।
শুকানো তুলসীর মঞ্চে
নিষ্প্রদীপ অন্ধকার নামে,
আগাছায় ভরেছে উঠোন।
সূর্য পাটে বসেছে কখন।
রাখালের দেখা নেই—
কোথাও গরুর পাল ওড়ায় না ধুলো;
ঢেঁকিতে ওঠে না পাড়,
একটি কলসীও জল ওঠায় না ঘাটে।

বুনো ঘাসে পথ ঢাকে,
বিনা শাঁখে সন্ধ্যা হয়,
সূর্য বসে পাটে।
তাঁতি বোনে নাকো তাঁত,
কলু আর ঘোরায় না ঘানি;
কুমোরের ঘরে চাবি,
ঝাঁপ বন্ধ, নিরুদ্দেশ হয়েছে দোকানি,
হাতুড়ি বিকিয়ে হাটে
ভস্ম মেখে পড়ে থাকে বেকার হাপর।
যে পথে কামার গেছে
কে জানে সে পথের খবর?
শীতের আমেজ আসে;
জ্বলে না আগুন চণ্ডীমণ্ডপের কোলে।
হাতে হাতে ঘোরে নাকো হুঁকো
চুলোচুলি হয় নাকো মোড়লে মোড়লে।
নিশুতি রাত্রিতে কারো
চৌকি শুনে কুকুর ডাকে না,
দিগন্তের বনস্পতি হাত নাড়ে,
মাঠের সোনালী ধান গুচ্ছ গুচ্ছ বাড়ে।
দুচোখে প্রতীক্ষা তার
স্বপ্ন তাকে করাঘাত করে।
ডাক ওঠে শহরে শহরে।
রাস্তার শ্মশানে থেকে মৃতপ্রায় জনস্রোত শোনে;
মাঠের ফসল দিন গোনে।

প্রতিজ্ঞাকঠিন হাতে
একে একে তারা সব
চোখের শোকাশ্রু মুছে ভাবে—
ঘরে ঘরে নবান্ন পাঠাবে।
পথে পথে পদশব্দ ওঠে,
আকাশে নক্ষত্র ফোটে;
নদী করে সম্ভাষণ, পাখি করে গান—
মাঠের সম্রাট দেখে মুগ্ধ নেত্রে
ধান আর ধান।

জনযুদ্ধ, ১৩৫০

ব র্ষ শে ষ

সূর্য বসে পাটে।
কঙ্কালবিক্ষিপ্ত খালে,
দ্বারস্থ কবরে, ঘর-জ্বালানো শ্মশানে,
জনশূন্য হাটেমাঠে,
সীমাহীন নিরুদ্দিষ্ট আলে—
পিছনে মূর্ছিত পথ;
সম্মুখে দাঁড়ানো কোন্ ভবিষ্যৎ,
কোন্ প্রতিশ্রুতি?
হাতে দুঃখহর্ম্য কোন্ বিশল্যকরণী?
প্রেম আজ ভুলেছে শপথ,
অনাবৃত লজ্জা ঢাকে অন্ধকার শুধু।
স্মৃতি হানে কাঁটার মুকুট;
দ্বিধা হতে চেয়েছে ধরণী।
নিথর নিশ্চল জল হারানো দীঘির
—ভারাক্রান্ত চোখে ঢেউ লাগে।

ভাগ্য আজ হয়েছে বধির।
পথে পথে ভগ্নস্তূপ,
চক্রবৎ ফিরেছে মড়ক।
দুয়ারে দুয়ারে বাঁধা যমদূত
মুহুর্মুহু কড়া যায় নেড়ে,
রক্তলোভাতুর শিবা গন্ধে গন্ধে ফেরে।
দিশাহীন জীবনের গোলক ধাঁধায়
দুমুঠো অন্নের মোহে
গ্রাম ছুটে চলেছে শহরে।
ভিটা শূন্য প'ড়ে,
আকাশের কণ্ঠরোধ করে পদধূলি।
ক্রূর অট্টহাসি খেলে
সওদাগরী ডিঙায় ডিঙায়।
রাখাল এখন দূর শহরের কুলি।
মাঠে মাঠে ধরেছে ফাটল,
আপন দর্পণে মুখ দেখে রসাতল।

পিছনে পাষাণবৎ অন্ধকার ভাঙে
সম্মুখে টলায়মান দেয়ালে দেয়ালে
মুষ্টিবদ্ধ হাত এসে লাগে।

আগে চলো, আগে—
তরঙ্গে তরঙ্গে বেগ
বজ্র দাঁতে কাটে মেঘ
অরণ্য বাড়ায় বাহু শিলাবৃষ্টিঝড়ে—
কঠিন মাটিতে ক্রুদ্ধ পদশব্দ,
আগে চলো, আগে!
অন্তরীক্ষে গুরু গুরু প্রতিধ্বনি জাগে।
পর্বতের চোখে জাগে সাড়া—
আকণ্ঠ ধূমায় বহ্নি
ঠেলে ওঠে অনর্গল লাভা।
বেত্রাহত অন্ধকার শিহরায় ভয়ে—
আকাশে আকাশে ফোটে আরক্তিম আভা।
লক্ষ কণ্ঠে হুঙ্কারিত জয়ে
অন্ধকার যবনিকা দুহাতে সরায়।
ওঠে সূর্য দেশে দেশে
রক্তপদচিহ্ন তার
দিক থেকে দিগন্তে গড়ায়।

ফররুখ আহমেদ

ধু লি ত ল

মৃত্যুকে ডাকিনি আমি তবু সেই মৃত্যু এল কাছে,
অজ্ঞাত, অনবধেয় তা'র সেই আবর্ত সংকুল
অনাবৃত বারিরাশি করিল না মুহূর্তের ভুল;
শ্মশানে শবের গন্ধ কাড়াকাড়ি মানুষে পিশাচে।

তখনো শুনেছি আমি ঃ আশা আছে, আজো আশা আছে
তোমার গলিত হাড়ে জাগিবে নতুন তৃণাংকুর;
মৃত্যুপার হতে তুমি শুনিবে 'বাসন্তী-নিশা' সুর,
মৃত্যুকে ডেকেছি আমি তারপর ঃ এস, এস কাছে॥

আমার মৃত্যুর বুকে জাগিবে না শুধু শীর্ণ হাড়,
আমার মৃত্যুর ছায়া! হবে না সে বাধার পাহাড়,
আমার প্রবাল-মৃত্যু জাগাইবে শস্যশ্যামা দ্বীপ,
আমার মৃত্যুর দীপ্তি নাবিকের তারকা-প্রদীপ,
রাত্রিভরা তারা দোলে আমার মৃত্যুর চাঁদোয়ায়;
ধূলি ডাকে অবিশ্রাম ঃ ফিরে আয়, ওরে ফিরে আয়।

সওগাত, ১৩৫০

লা শ

যেখানে প্রশস্ত পথ ঘুরে গেল মোড়,
কালো পিচ ঢালা রঙে লাগে নাই ধূলির আঁচড়,
সেখানে পথের পাশে মুখ গুঁজে প'ড়ে আছে জমিনেব 'পর;
সন্ধ্যার জনতা জানি কোনদিন রাখে না সে মৃতের খবর।

জানি মানুষের শব মুখ গুঁজে প'ড়ে আছে ধরণীর 'পর
ক্ষুধিত অসাড় তনু বত্রিশ নাড়ীর তাপে
প'ড়ে আছে নিসাড় নিথর,
পাশ দিয়ে চ'লে যায় সজ্জিত পিশাচ, নারী, নর
পাথরের ঘর,
মৃত্যু কারাগার,

সজ্জিতা নিপুণা নটী খুলিয়াছে বারাঙ্গনা দ্বার
মধুর ভাষণে,
পৃথিবী চষিছে কারা শোষণে, শাসনে;
সাক্ষ্য তার রাজপথে জমিনের 'পর
সাড়ে তিন হাত হাড় রচিতেছে মানুষের অন্তিম কবর।

প'ড়ে আছে মৃত মানবতা তারি সাথে পথে মুখ গুঁজে।
আকাশ অদৃশ্য হ'ল দাম্ভিকের খিলানে, গম্বুজে
নিত্য স্ফীতোদর;
এখানে মাটিতে এরা মুখ গুঁজে মরিতেছে ধরণীর 'পর।
এ পাশব অমানুষী, ক্রূর
নির্লজ্জ দস্যুর
পৈশাচিক লোভ
করিছে বিলোপ
শাশ্বত মানব-সত্ত্বা মানুষের মুক্তি-অধিকার
ক্ষুধিত মুখের গ্রাস কেড়ে নেয় রুখিয়া দুয়ার
মানুষের হাড় দিয়ে গড়ে খেলাঘর;
সাক্ষ্য তার প'ড়ে আছে মুখ গুঁজে ধরণীর 'পর।

স্ফীতোদর বর্বর সভ্যতা
এ পাশবিকতা,
শতাব্দীর ক্রূরতম এই অভিশাপ,
বিষাইছে দিনের পৃথিবী;
রাত্রির আকাশ।

এ কোন্ সভ্যতা আজ মানুষের চরম সত্ত্বাকে
করে পরিহাস?
কোন্ ইবলিস আজ মানুষেরে ফেলি মৃত্যু পাকে
করে পরিহাস?
কার হাতে হাত দিয়ে নারী চলে কাম সহচরী?
কোন্ সভ্যতার?
কার হাত অনায়াসে শিশুকণ্ঠে হেনে যায় ছুরি?
কোন সভ্যতার?
পাঁজরার হাড় কেটে নৃত্য সুর জেগে ওঠে কার?
শ্রমিকের রক্তপাতে পান-পাত্র রেঙে ওঠে কার?
কোন্ সভ্যতার?

মানুষ তোমার হাতে করিয়াছে কবে আত্মদান,
তারি শোধ তুলে নাও হে ক্রূর সভ্যতা শয়তান!
শিশুর শোণিত হেসে অনায়াসে করিতেছ পান,
ধর্ষিতা নারীর দেহে অত্যাচার করিছ অম্লান,
জনতার সিঁড়ি বেয়ে ঊর্ধ্বে উঠি, অতি অনায়াসে
তারে তুমি ফেলে যাও পথপ্রান্তে নর্দমার পাশে।

মৃত সভ্যতার দাস স্ফীতমেদ শোষক সমাজ!
মানুষের অভিশাপ নিয়ে যাও আজ,
তারপর আসিলে সময়
বিশ্বময়
তোমার শৃংখলগত মাংসপিণ্ডে পদাঘাত হানি
নিয়ে যাব জাহান্নাম-দ্বারপ্রান্তে টানি'—
আজ এই ক্লেদাচ্ছন্ন, উৎপীড়িত নিখিলের অভিশাপ বও
ধ্বংস হও, তুমি ধ্বংস হও॥

মোহাম্মদী, ১৩৫০

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

অ ভি শা প

হঠাৎ বুঝেছি এই বিসর্পিল মুহূর্তের ভাবে
কিশোরী মেঘের মতো লঘুপক্ষে ভর দিয়ে যাওয়া
শেষ হবে।
আবর্তিত সমরের অন্ধকারে যবে
তারাগুলি মৃতপ্রায়, চাঁদ অস্তগত
হাওয়ার শিরায় শুধু দুর্ভিক্ষ স্পন্দিত।
নগরের দীর্ঘপথ, ডাস্টবিন, পিচে
অজস্র পায়ের শব্দ। আকাশের নিচে
সারি সারি চলে তারা কঙ্কালে মিছিলের মতো
তাদের কিছুই নেই শুধু এক মরণ উদ্যত।
খাদ্য নেই ক্ষুধা আছে ঃ এ কি অভিশাপ?
দেহ নেই প্রাণ আছে, হৃদয়ে উত্তাপ।
এদের বঞ্চিত ক'রে মাঠ-ধান লুটে
ধন্য তুমি মহাজন, সোনা বাঁধ খুঁটে।

উত্তপ্ত আকাশে দেখি ক্ষমাহীন সূর্য শুধু জ্বলে
আরো এক সূর্য আছে মানুষের হৃদয়ের তলে।
সে-অগ্নির অভিশাপ দেয় আজ সহস্র ভিক্ষুক
তোমার সুবর্ণ দিনে শতাব্দীর আগুন লাগুক!

রাজধানীর তন্দ্রা, ১৩৫০

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

দু র্দি নে

আহা ছোট ছেলে জীর্ণ শীর্ণ
দেখিলেই তারে দুঃখ লাগে
ভিক্ষার লাজ ভাঙেনি এখনো
জড় সড় হয়ে ভিক্ষা মাগে।
দু'টি দিন তার জোটেনি আহার
কেঁদে কেঁদে বসে গিয়াছে আঁখি,
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর
মূর্তি ধরিয়া আসিল নাকি?
অনেক গিয়াছে দুখ দুর্দিন
ইতিহাস তার খপর জানে
সবই সহা যায়, শিশুর উপোস-
আঁখির সমুখে—সহেনা প্রাণে।
খাওয়াইয়া তারে ডাকিলাম কাছে
আসিয়া বসিল আমার ঘরে,
পটে শ্রীহরির মূর্তি দেখিয়া
ভূমেতে লুটায়ে প্রণাম করে।
প্রণাম করে সে আমি কেঁদে মরি
কৃতঘ্ন বলে মানুষে তবু,
তুমি ভুলিয়াছ অনাথ বালকে
সে কই তোমারে ভোলেনি প্রভু?
কখন পাতিলে কমল আসন
দিগ্ধ দগ্ধ কোমল মনে,
বুঝিনে তাহার কি আত্মীয়তা
কি যে পরিচয় তোমার সনে।
তোমারে দেখেই চিনেছে সে আগে
অন্নদাতার অন্নদাতা,
দুঃখে রেখেছ—তবু জানে তুমি
দুঃখ হরণ বিশ্বপাতা।
অন্তর্য্যামী তুমি ত দয়াল
সব ব্যথা তব হৃদয়ে বাজে,
মানুষ সাজিয়া কাছে এসো তাই
সুদূর স্বরগে থাকা কি সাজে?

ভারতবর্ষ, ১৩৫০

কালিদাস রায়

অ প চ য়

এক হাতে লোক খাক্‌না খাবার
দশ হাতে তা ছড়াও কেন?
খালি পেটে কাঁদছে হাজার
ভরতি জঠর ভরাও কেন?
মেনে মিছে সমাজ শাসন
শ্রাদ্ধ বিয়ে অন্নপ্রাশন
ছুতো ধরে তেলা মাথায়
তেলের ভাণ্ড চড়াও কেন?
ভোজ লাগিয়ে করছ ঘটা
টাকার বড়াই জাহির করে,
খোঁজ রাখ কি রোজ কত লোক
মরছে তোমার বাহির দোরে।
জিভে যাহার নেইক রুচি
তার পাতে দাও পোলাও লুচি
পয়সা কি হায় খোলাম কুচি,
লোকের ভয়ে ডরাও কেন?
না খেয়ে লোক যাচ্ছে মরে
বেশী খেয়েও কম মরেনা
চোর ডাকাতে হরণ করে
জাতকুটুমে কম হরে না।
লোকের স্বাস্থ্য হরণ করি
যমকে আনো চরণ ধরি
অলক্ষ্মীরে বরণ করি
মা লক্ষ্মীরে তাড়াও কেন?

ভারতবর্ষ, ১৩৫১

বন্দে আলী মিয়া

শারদ শ্রী

চারিদিকে শুনি হাহাকার—
'এক মুঠি দানা দাও', নরনারী করে চীৎকার।
পল্লীর ঘরে ঘরে ভাণ্ডার হইয়াছে খালি
পরণে ছিন্নবাস—সারা ঠাঁয়ে জোড়া আর তালি;
চালে কারো খড় নাই—বরষায় বাস করা দায়—
মহাজন নিয়মিত প্রতিদিন আসে তাগাদায়।
হাঁড়িতে চাউল নাই—সবে মিলে রহে উপবাসী
হালের বলদ জোড়া হাটে লয়ে বিকায়েছে চাষী;
আর তার কিছু নাই সর্বহারা নিরুপায় হয়ে
পথে আসে বাহিরিয়া বধূ আর ছেলে মেয়ে লয়ে।
ভিখ নাহি মেলে কোথা—পল্লীতে নাই কিছু আর
শহরেতে যায় তারা—হয় তো বা মিলিবে খাবার।

নগরের রাজপথে গৃহহারা নর-নারী চলে
'এক মুঠি খেতে দাও' জনে জনে সকাতরে বলে।
তাহাদের পানে কেহ ফিরে নাহি চায় একবার
আপনার কাজে চলে—অবসর নাহি শুনিবার।
শিশু কাঁদে মার কোলে এক ফোঁটা দুধ লাগি হায়
'এতটুকু ফেন দাও।' মাতা তার দ্বারে দ্বারে চায়।
অনাহারে কাটে দিন—ফুকারিয়া কাঁদে ক্ষুধাতুর
'দয়া করো প্রাণ যায়'—হেথা হতে শুনি তার সুর
রাস্তায় ফেলে দেয়া এঁটো পাতা কুড়াইয়া সবে
খুঁটে খুঁটে ভাত ডাল খায় তারা মহা কলরবে।
মানুষে কুকুরে আজ কোনো যেন ভেদাভেদ নাই
রাজপথে চলি আর প্রতিদিন চেয়ে দেখি তাই।

ভারতবর্ষ, ১৩৫১

স র্ব হা রা

"অন্ন দাও অন্নপূর্ণা" প্রার্থনা করে আজ শিব—
অনাহারে প্রাণ দেয় প্রতিদিন অগণন জীব।
আজো যারা বেঁচে আছে, হইয়াছে কঙ্কাল সার
রাক্ষসী তিলে তিলে জনপদ করিছে সংহার।
রাজেন্দ্রাণী বঙ্গভূমি এ ভারতে ছিল চিরকাল—

আজ আর কিছু নাই, রহিয়াছে স্মৃতির কঙ্কাল।
একদা জননীসম সবাকারে করিত পালন
আজি রিক্তা কাঙালিনী "অন্ন দাও" করিছে রোদন-
বন্যায় ভেসে গেছে—ধান্য কিছু নাই আর মাঠে।
সর্বহারা পল্লীর দিন আজ উপবাসে কাটে।
কাঁদে জায়া কাঁদে পুত্র—কাঁদিতেছে বন্ধু পরিজন।
খাদ্য বিনা হইয়াছে আজি হায় দুর্বহ জীবন।
ক্ষুধাতুর ফুকারিছে, "প্রাণ যায় খাদ্য দাও দুটি"—
পথে পথে শ্বাসহীন ক্ষীণ দেহ পড়িতেছে লুটি।

বসুমতী, ১৩৫০

ক্ষু ধা তু র না রা য় ণ

বিধু ও করিম দুজনে কিশোর হিন্দু-মুসলমান
দেশ থেকে তারা এসেছে পালিয়ে বাঁচাতে আপন প্রাণ।
গ্রামেতে ওদের পাশাপাশি বাড়ী—ভাব খুব দুইজনে
দুইটি বন্ধু সারা দিন রাত রয় তাই এক সনে।
ওদেরি মতন আরো কতজন—কত শিশু কত নারী
পথে এসে আজ বাঁধিয়াছে বাসা আপনার ঘর ছাড়ি'—
হাত পেতে তারা ভিক্ষা মাগিছে, "একটি পয়সা চাই,
ক্ষুধায় মোদের প্রাণ যায় বাবু কাল থেকে খাই নাই।"
চলে লোকজন—চলে ঘোড়াগাড়ী—চলে ট্রাম চলে বাস
মিলিটারী ভ্যান চলে ঝড় যেন উড়ায়ে ধূলির রাশ।
বেলা পড়ে আসে—তাহাদের পানে কেহ নাহি ফিরে চায়-
ছোট বুক থেকে দীর্ঘ নিশাস ধীরে ধীরে বাহিরায়।

লঙরখানার কাছে

ক্ষুধাতুর যত নরনারী শিশু প্রত্যাশে বসে আছে।
ভাত দিতে এলে আগে নেবে বলে পড়ে যায় কাড়াকাড়ি
মানুষ মানুষে পশুর মতন শুরু করে মারামারি।
কেহ এক মুঠা—কেহ আধ পেটা—পেট ভরে নাহি পায়
শুধু দুটি ভাত—এক মগ জল—আর নাহি কিছু চায়।
বিধু ও করিম লঙরখানার ঘুরিতেছে কাছে কাছে
এক মুঠা দানা পাইলে ওদের দু'জনের প্রাণ বাঁচে।
ধনী ও গরীব এই দুটা জাত রয়েছে ধরণী ' পরে
তারা হিঁদু নয়—মুসলিম নয়—তারা নয় কারো তরে।
গরীবের দল উপবাসী থেকে পথে পথে পড়ে আছে
তাদের তরে কি ধনীর বিলাস এতটুকু কমিয়াছে!
পথে যেতে যেতে সেদিন দেখিনু ট্রাম রাস্তার ধারে
একটি রমণী মরে আছে পড়ে—কেহ না দেখিছে তারে।
ছোট দুটি ছেলে খেলা করে পাশে—শিশুটি খেতেছে মাই
জানেনাকো তারা জননী তাদের এ ধরায় আর নাই।
বিশাল নগরী কলিকাতা মাঝে অগণন লোকজন
ক্ষুধার জ্বালায় কে মরেছে কোথা করে কে অন্বেষণ!
গৃহহীন নর রোদে পুড়ে আর জলে ভিজে হলো সারা
পেটে দানা নাই—আশ্রয় নাই—ভেবে ভেবে দিশে হারা।
সারা দিন ধরি ঘুরে ফিরে রাতে ফুটপাথে পড়ে রয়
উপোসীর চোখে ঘুম নাহি হায়—জাগে সারা রাতি ময়।
শত সভা আর বক্তৃতা—যাহা করিবারে পারে নাই
খাদ্য কাঙাল হইয়া মানুষে আজিকে হয়েছে তাই;
হিন্দুর পাত কুড়াইয়া রোজ মুসলমানেরা খায়
মুসলমানের ভাত আর জল হিন্দুরা আজ চায়।
উদর তীর্থে মিলিয়াছে এসে হিন্দু-মুসলমান
এই বন্ধন নাহি যেন টুটে—দয়া করো ভগবান।
কাঙালের বেশে নারায়ণ আজ এসেছে তোমার দ্বারে
অনাদর করি রিক্ত হস্তে তাড়িয়ে দিও না তারে।

শারদীয় আনন্দ বাজার, ১৩৫০

আবু নয়ীম মোহাম্মদ বজলুর রশীদ

ব্র ড কা স্টিং

ব্রডকাস্টিং স্টেশন—
উপরে উড়ছে এয়ারিয়াল মাস্ট; ইউনিয়ন জ্যাব—
ধূসর বর্ণের ক্যামুফ্লাজ রং মাখা—

হেমন্তের স্পর্শ লেগেছে গায়, হিমেল অবগুণ্ঠনে
আপনাকে রেখেছে অন্তরাল করে।
এখানে সেখানে রূপের ডালি বহন করছে
লিলাক্, কস্‌মস্, প্যানজি—তার পাশে
শেফালি বাঙালি বধূর মত ফুটে গাছে
আপনার অনাবশ্যক অস্তিত্বকে সংকুচিত করে।
পাশ নিয়ে ঢুকে পড়ি—এক নম্বর স্টুডিওতে
চলেছে গান, পূরবীতে লেগেছে নিখাদ—
যেন হঠাৎ ফুটে ওঠা মাধবীর রং
পথ চলতে ভেসে আসা অজানা ফুলের গন্ধ।
দু'নম্বর স্টুডিও—লাল বাতি উঠে জ্বলে
নব পর্য্যায় হলো শুরু—
তপ্ত বালু, মরুভূমির বুকে বিজয়-কেতন
উড়িয়ে চলেছে অষ্টম বাহিনী
আল্-আমিন্, মারেথ লাইন, স্পাক্স, সুসা
তিউনিস বিজেরটার পতন—সিসিলি জয়···
শব্দের শক্তি ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক তরঙ্গ হয়ে
ছুটে পড়লো দিকবিদিকে—অ্যাপলটন স্তরে পেল বাধা
মাটির বুকে এলো ফিরে—রেডিওর মিটারে দিল ধরা।

কথা হলো শেষ, বাইরে এলেম চলে
মনে আনন্দে—পকেটে চেক্।
দূর হতে ক্ষীণ শব্দ এলো ভেসে—
দেখি দুর্ভিক্ষের প্রতিমূর্তি কংকাল,
শীর্ণ হস্ত মেলে আছে; 'অন্ন দাও—
অন্ন-অন্ন-' কে শোনে কার কথা?
ফিরে চাইলাম মাস্টের দিকে—

এই যে বুভুক্ষু দুর্গত এর এই অস্ফুট আবেদন
তুমি কি পার না ব্রডকাস্ট করতে
ইথারে ইথারে ছড়িয়ে দাও লোক হতে লোকে
ক্ষুধিত মানবের মুমূর্ষু আর্তনাদ।
একজন শুধু শুনছেন এর ক্রন্দন
বিশ্বের অন্তরাল হতে ধরণীর বিচিত্র সুখ-দুঃখ
যিনি করছেন অনুভব—
দয়া করুণা ক্ষমার শান্তচ্ছায় প্রসারিত করে—
যিনি চিরপরিপূর্ণ স্বয়ংভু।

মোহাম্মদী, ১৩৫০

অ ভি শা প

মাঘের শীত—ক'দিন ধরে আকাশে জমেছে মেঘ,
বৃষ্টি পড়ছে সারা সকাল—
জামগাছের কচিপাতায় উঠেছে নবজীবনের স্পন্দন;
যে পাতা এখনো আসেনি'—
শাখার শিরায় শিরায় জীবন রসের পেয়েছে আস্বাদ—
ফাল্গুনে দেখা দেবে অফুরন্ত প্রাণ উৎসে অবগাহন করে।
মাধবী বনমল্লিকার পুলক উচ্ছ্বাস
বৃক্ষজগতে জেগেছে নবপরিকল্পনা;
বসন্তের উৎসবে কে দেবে ফুল অশোক পলাশ করবী,
সন্ধ্যামালতী রজনীগন্ধা কোন্ আনমনা
মন করে দেবে উন্মনা;
বেলী হবে কার কবরীর মালা—
কোন নব পরিণীতার কম্বুকণ্ঠের হার।
বসে আছি—আবার এলো এক পশলা বৃষ্টি।
প্রিয়ার তন্বী দেহের একটু স্পর্শ
রক্তের চাঞ্চল্য নিয়ে এলো বাদল রজনীর
স্বপ্ন বিজড়িত অতন্দ্র অস্তিত্ব।
ক্যাম্প চেয়ারে র‍্যাগখানা টেনে আর একটু আরামে
আয়েসে পড়লাম শুয়ে।
গলায় প্রেয়সীর হাতে বোনা কম্ফর্টার,
বেগনী রঙের উলের জামা পরেছি গায়।

কলম কাগজ নিয়ে উঠে পড়লাম
অভিনন্দন জানাবো মহাসাগর পারের
মেঘের কণা মৌসুমী পথের পথিককে।
হঠাৎ পড়ে গেলো মনে—
আরমানিটোলার মাঠের ধারে মেহেদীর বেড়ার পাশে
এক শীর্ণা নারী বেঁধেছে বাসা দারিদ্র আর বুভুক্ষা নিয়ে।
দেখেছিলাম পথে যেতে হাড়িকুঁড়ির মধ্যে
বসে বসে সেলাই করছে শতছিন্ন কাঁথা।
আমার কাছে চেয়েছিল পয়সা
প্রত্যাশার অতীত আশা নিয়ে।
আজ বাদলে বসে বসে ভাবি—
এই যে আমার আরাম আয়েস
ধিক্কার কি দেবেনা আমাকে?
নিরন্ন বস্ত্রহীনার অভিশাপ কুড়িয়ে
মেদপুষ্ট উষ্ণ দেহের বিলাস
সত্য কি এনেছে শান্তি?
মনে হল সকল গরম বস্ত্রের
অনাবশ্যক ভার ফেলে দিয়ে—
বেরিয়ে পড়ি তাদের সাথে নিঃসম্বল যারা
দুর্ভিক্ষের দুর্বিসহ বোঝা বহন করে ফিরছে পথে পথে
বিনা প্রতিবাদে।

মোহাম্মদী, ১৩৫০

গোলাম কুদ্দুস

দ্বৈ র থ

নিচে ভাগাড়ের মড়া মৃত্যুতন্দ্রা হতে দলে দলে
জাগরিত, কলা-পাতে জলবৎ তরল খিচুড়ি
সুপ্ত সঞ্জীবনী সুধা! লাইনের শেষে হামাগুড়ি
মেরে আসে সপ্তদশী—শুক্লপক্ষ শশী অস্তাচলে!

তবু দুই চোখে ভরে অস্তমিত আলোর অঞ্জন
ফেলে লুব্ধ দৃষ্টি দূর ক্ষীয়মান অমৃত ভাণ্ডারে,
পংক্তিশেষে রহিবে কি অবশিষ্ট? হাত নাড়ে
মিনতিতে, খুলে পড়ে বক্ষ হতে বিস্রস্ত বসন।

উপরে দোতলা ঘরে দাতাকর্ণ হ্মতে রেখে মুখ
সেই দিকে চেয়ে থাকে উপবাসী ব্যাঘ্রের মতন,
দু'খণ্ড স্ফুরিত মাংসে স্থির স্তব্ধ দৃষ্টির কৌতুক,
পেশীর অরণ্যতলে শিকারীর বিজ্ঞ বিচরণ,
শীর্ণ শশী গ্রাসে রাহু অবিলম্বে উৎসুক উন্মুখ,
কিন্তু, হায়, কোনদিন দেখিবে না অন্যের নয়ন।

১৩৫০

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

মে ঘ বৃ ষ্টি ঝ ড়

১

চলে এলুম, তোমায় ছেড়ে চলে এলুম।
সখী আমার হারানো দিন ভালবাসার ভীরু আশার,
তবু তোমায় ছেড়ে এলুম, ছেড়ে এলুম।

চষা-জমির কানে কানেই ভোরবেলার সোনালি গান
গেয়েছিলুম পেয়েছিলুম তার বুকেই ফিরে আসার
ইশারা ঃ প্রাণ, সবুজ ধান, সোনালি ধান।

তবু কখন ঈশানে মেঘ ঈষৎ চায়—
তবুও তার ধূসর চোখ ঘূর্ণি-ঘুরঘুর হাসার
মাটির বুক ফাটার সুখে প্রাণ বাঁচায়!
কোথায় দূরে মিলিয়ে যায় সখী তোমার তাল-তমাল।
মরাই নেই, ধানও নেই, সবুজ ধান ভালবাসার।
ঈশান আনে জোর তুফান, ঘোর আকাল।

২

সব শেষ?
সবুজ দিন, শ্রান্তিহরা আকাশ নেই নেই—
সব শেষ?…
ছাড়াই মাঠ, ছাড়াই হাট ধূসর পায়ে পায়ে
মিলছি ভূখ-মিছিলে গায়ে গায়ে,
কারখানায় অন্ধ, দিকভ্রান্ত ভয় ভয়,
মনের দিকপ্রান্তে ঠিক সন্ধ্যা হয় হয়,
ভালবাসার
ভীরু আশার
এই কি শেষ নয়?

কখন এরিমধ্যে সেই আশার হাতছানি—
তোমায় খুঁজি; এদিক-ওদিক চলছে কানাকানি।
কোথাও তুমি নেই যে তাও জানি।

সেই তোমার সবুজ শাড়ি, কালো কাজল-চোখ
ছিঁড়ল টেনে সংগ্রামের সংঘাতের নখ।
সময় নেই, সময় নেই
কবে জানাই শোক।

তবু জানাই শোক!

হঠাৎ কালো হাওয়ায় তাই কিসের গুঞ্জন।
যন্ত্রে যদি মেলাই হাত, মেলায় হাত মন
কিসের গুঞ্জন।
স্তব্ধ মেঘ লক্ষ বুকে হৃদয় দেয় শোধ।
যন্ত্রনায় যুদ্ধ। প্রতিরোধ।

আকাশভরা হাওয়ায় ঝরা-পাতার মর্মর
—কখন এল ঝড়!

৩

শেষরাত্রে মরুধূসর ঝড় এল।
তারপর হঠাৎ এলোমেলো
হাওয়া, হাওয়ায় বৃষ্টি নামলো।
তারপর কখন ভোরের চমক। বৃষ্টি থামল।

৪

জানতুম। তুমি ঘোমটা-টানা ফুল রজনীগন্ধা,
লজ্জা-পাওয়া রাঙিয়ে-ওঠা সন্ধ্যা—
নিতান্ত এক গাঁয়ের মেয়ে।
ধান ভানতে, জল আনতে
অজান্তে পথ বেয়ে।
সুখেই ছিলুম, এমন দিনে আকাল এল।
ঘর ছাড়লুম, জীবন কী যে দশায় গেল!
সঙ্গে তুমি। পথ হারালে
পা বাড়ালে
ঝড়ে।
রইল না কেউ ঘরে, সুখের ঘরে।

তারপর সেই ঝড়ের হাওয়ায়
হঠাৎ-জাগা অন্ধকারে আবার দেখি তোমায় ঃ
পাগলা হাওয়ায় চুল উড়ছে
চুল ঘুরছে
জ্বালামুখীর সাপ
চোখে তোমার প্রলয়-পীত তাপ—
তখন আবার ভাবলুম, এ কি তুমিই? তুমি সুখী (
নও!
প্রাণের মধ্যে আজও আদিম আগুন কি বও?
তাই কি ঝড়ের হাজার ফণায় আগুন জ্বলে?....
তারপর সেই আগুন গলে চোখের জলে।
আমার মনের আবাদ ভ'রে বৃষ্টি ঝরে...সোনাও য

গান ধরলুম আয় বৃষ্টি ঝেঁপে।
ফিরব যখন ভাঙা বাসায়—দাওয়ায় মাটি লেপে
চাষ করব, গান ধরব, ধানও দেব মেপে।
আয় বৃষ্টি ঝেঁপে।

তারপর কখন ভোর হয়েছে,
বৃষ্টি নেই, হাওয়ায় আলোর ঘোর রয়েছে।
উঠে বসলুম,
সুখে হাসলুম,
মনে ভাবলুম—এবার তুমি আসবে,
আবার ভালবাসবে।
আবার আমি ঘর বাঁধব, মন সাধব জীর্ণ দেহে
জীবনকে ফের গড়ে তোলার গভীর স্নেহে।

পরিচয়, ১৯৪৫

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আ শ্চ র্য ভা তে র গ ন্ধ

আশ্চর্য ভাতের গন্ধ রাত্রির আকাশে
কারা যেন আজও ভাত রাঁধে
ভাত বাড়ে, ভাত খায়।
আর আমরা সারারাত জেগে থাকি
আশ্চর্য ভাতের গন্ধে
প্রার্থনায়, সারারাত।

ম হা দে বে র দু য়া র

৪

গাছতলার এই যে মানুষ
উপোস জানে না:
উপোস জানে না ব'লে জঠরজ্বালায় তিলে তিলে
'হা অন্ন, হা অন্ন' বলে
গাছের ছায়ায় তবু দাউ দাউ জ্বলে যাচ্ছে।

যদি সে উপোস জানত
তার জন্য প্রতিদিন সোনার থালায়
পরমান্ন আনত সুজাতা

কিন্তু সে সন্ন্যাসী নয়, সাধারণ নির্বোধ মানুষ।

২৮

অনন্ত কাকের মেলা চার দিকে
আর সব পাখি যদি
ফুরিয়ে গিয়েছে;
আকাশে কেবল ধোঁয়া, ধুলো কার্বন
আর দিনরাত ঘোলাটে ডানার শব্দ,
ক্ষুধার চিৎকার!

৩৭

একটি নষ্ট পচা ফলের জন্য
ভিক্ষুকেরা সবাই হাত বাড়ায়,
'আমাকে দাও, আমাকে দাও, আমাকে'...
যেন আগুন লেগেছে ঐ পাড়ায়।

ফলটি ছুঁড়ে দিতেই বাঁধল দাঙ্গা,
ভিক্ষুকদের খুনোখুনি থামায় কে?

যশোদাদুলাল মণ্ডল

ক্যা ল কা টা না ই ন টি ন ফ র্টি-থ্রী অ ক্টো ব র

ক্যালকাটা নাইনটিন-ফর্টি থ্রী অক্টোবর—
এ আর পী মিলিটারি,
পথেঘাটে ভিখারী,
অ্যাকসিডেন্ট আর ক্রাউড,
কন্ট্রোল পারমিট ব্ল্যাকআউট।
আর সব জিনিসের বাড়ল দর।

চাল ডাল তেল আটা ময়দা কন্ট্রোল হয়েছে।
বাড়ীর বৌরা রান্না ছেড়ে লাইন দিয়েছে।
হাঃ হাঃ কন্ট্রোল!
চলতে ফিরতে কথা কইতে কন্ট্রোল কন্ট্রোল,
সবটাতেই কন্ট্রোল—
শ্বশুরবাড়ী যাওয়া কন্ট্রোল কর ভাই,
ঘন ঘন যেতে হলে পারমিট কাটতে চাই,
চাই চাই চাই পারমিট কাটতে চাই।

বাহিরে ব্ল্যাকআউট ভিতরে ব্ল্যাক-ইন।
ব্ল্যাক মার্কেট চলছে তবুও মেলে না কয়লা কেরোসিন।
অন্ধকারে ধাক্কা লাগে ব্যাফল ওয়ালের গায়;
ভিতর থেকে কারা দু'জন ছুটে বাহিরায়—
চুপি চুপি নিলাম পিছু একটি নারী আর একটি নর—
স্বামী-স্ত্রী কিংবা আর কিছু আর কী ভয়ংকর!
ক্যালকাটা নাইনটিন-ফর্টি থ্রী অক্টোবর॥

সুরেশ বিশ্বাস

কে লবে সেবার ভার?

আত্মকলহে মত্ত এ জাতি কে লবে সেবার ভার?
সবাই নায়ক, সবাই চালক, পূজারী নাহিক মা'র।
চাই জননীর শ্রেষ্ঠ সেবক
অচল পথের অটল সাধক,
কল্যাণময়ী পূজারিণী কই স্বদেশ-মাতৃকার,
বক্ষে সুধার কুম্ভ কক্ষে প্রীতির ঝর্ণা যার।

অঞ্চল তলে না রাখি তনয়ে আপনার ছোট ঘরে
দুর্লভ মণি সন্ধানে তারে পাঠাবে দেশান্তরে।
সত্যাশ্রয়ী সত্য-পূজারী
সাম্য-মিলন-মন্ত্র প্রচারি,
হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য আনিবে পুনর্বার।
কর্ম্মী সাধক ন্যায়-প্রচারক, কে লবে সেবার ভার?

দু'মুঠো ক্ষুধার অন্ন জোটে না হাহাকার দেশময়,
জাপানী বোমারু-প্রতাপে হৃদয়ে জাগিছে মরণ-ভয়।
শান্তি-মন্ত্র কণ্ঠে কাহার,
কোথা সন্তান স্বদেশ-মাতার?
পীত ভীত দেশে আনিবে বহিয়া বাণী কে সান্ত্বনার?
বিপদে দৈন্যে অভয়চিত্তে কে লবে সেবার ভার?

বঙ্গশ্রী, ১৩৫০

আবুল হোসেন

মা ন প ত্র

হুজুর, হাজার সেলাম নেবেন গরীবের,
আপনি নিজেই এসেছেন, আমাদের জোর-
কপাল। চলুন, দেখবেন কিছু ঘুরে ফিরে।
এই গ্রামটিরে আদর্শ বলতে হয়, কি যে
নির্বিকার ঝক্‌ঝকে এ দিকটা। রোদে জলে ভিজে
সব যে করেছি নিজেরাই অবিশ্যি ঠিক তা
নয়, বিধাতাই সহায়, বাকিটা না বললেও
চলে আমাদেরই কাজ। দারুন দুর্দিনে যে যা
চেয়েছে বেচতে, যা-ই দাম হোক, আহা কী কষ্ট,
নিতে হলো কিনে। অকেজো বাড়তি লোকগুলো
গেছে শহরে, তাই তো খাওয়ার পরার শোওয়ার
ভাবনাও আর নাই, ঘরে ঘরে নির্ভেজাল শান্তি,
হয় না লড়াই। আর এমনি চমৎকার লোক এরা
নালিশও করবে না, আগাড় ভাগাড় যাই হোক
তিন হাত চাই মাটি শুক্‌নো হাড়ে সার দেয়ার।
মাটির সাথে একাত্মা, আহা কী সামান্য প্রয়োজন।
শব্দহীন নির্বিকার জলের জীবন। মৃত্যু আর
জীবন সমান। হুজুরের অপূর্ব শাসন।

১৩৫০

ম ন্ব ন্ত রে

আজ মনে পড়ে
মন্বন্তরে
আমরা এলাম এ শহরে।

গরু নেই গোয়ালে ধান নেই খামারে
মাছ নেই নদীতে কুমোর ও কামারে
কাজ আর পায় না বসে আছে তাঁতীরা
পথে পথে ঘুরে মরে করাতীরা।

চোখের সামনে ভেঙে পড়ে ঘর
কে আপন আর কে জানে কে পর।
ছুটে চ'লে, তাই, এলাম কলকাতায়
কী চমৎকার দোকানপাট
চোখ বুজে হাত পাতি
চেয়ে দেখি সেই শূন্য হাতই।
বাজারে পণ্য হাজার হাজার
মেলে না অন্ন তবুও ক্ষুধার,
ঘর আছে তবু মেলে নাকো ঘর।
এই আমাদের আজীবন স্বপ্নের সে শহর।
কত দূরে সেই ছায়াঘন নীল দিন,
সোনালী ধানের সুরভিত আশ্বিন।

১৩৫০

অবন্তী সান্যাল

কা হি নী

এক

ছোট ছোট কাহিনীরা অবশেষে হয় ইতিহাস।
আদিগন্ত জমায়েৎ পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ
আবার ঝড়ের কোন নির্মম প্রস্তুতি—
যদিও অনেক ঝড়ে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে
আমার আকাশ।
কুয়াশা মাখানো রোদ আজ এই মাঘের সকাল—
শীতের ভোরের ঘুম চুরমার হয়েছে কখন।
নুয়ে পড়া নিমডালে কলরব করে যায় কাক
গলিতে বিচিত্র সুরে ফেরিদার ডাক।
বিস্তৃত সংবাদপত্রে বিক্ষোভিত পৃথিবীর মন
বারুদের স্তূপ যেন,
তেরশো পঞ্চাশ সাল

পিছনে এসেছি ফেলে একে একে কুড়িটি বছর—
লোকে বলে ঃ জীবনের এই তো বসন্ত—
এখনো অনেক ঝড় পার হতে হবে
এখনো অনেক ঝড় প্রতীক্ষায় আমার দুয়ারে।
তবু যেন মনে হয়, অতিক্লান্ত, পরিশ্রান্ত আমি
ঘানি টেনে কুঁজো হয়ে বুড়ো হয়ে গেছি।
ভবিষ্যৎ অন্ধকার।
আশা নেই ভাষা নেই আগামীর কোনই আকার।
পরিচ্ছন্ন রাজপথ।

হাজারো রক্তের লেখা অলক্ষিতে মুছেছে কখন।
গ্রাম উঠে এসেছিলো এইখানে আমার শহরে,
অনেক বিদীর্ণ প্রাণ চূর্ণ চূর্ণ হ'য়ে
লিখেছিলো ভয়াবহ জীবন কাহিনী—
সে কাহিনী ভুলে গেছি সব।
আবার বিরামহীন মহাকাল সমুদ্রের নিস্তব্ধ উৎসব।

দুই

হে কুমার ফিরে এসো ঃ রাজধানী সানুনয়ে
পাঠালো প্রার্থনা
তোমার সোনার ধানে পালে পালে ছেয়েছে শকুন,
প্রজাহীন রাজ্যে তব পদচিহ্ন এঁকেছে শ্মশান।
তখনি ফিরেছি আমি—
ভিজে ঘাস পায়ে দ'লে শীতের শিশিরে।
আঁকাবাঁকা মেঠো পথে ছায়া ফেলে চাঁদ।
দুধারে ধানের ক্ষেতে সহস্র কঙ্কাল—
হাসিমুখে রাজপুত্রে করেছে গ্রহণ ঃ
হে কুমার দেখে যাও হাড়ে হাড়ে করেছি আবাদ
এবারে নতুন ধানে লেখা থাক্ আমাদের নাম।

পৃথিবীতে যুদ্ধ আজ, দেশে দেশে অনেক মানুষ
আপন হাড়ের দুর্গে গড়ে প্রতিরোধ
অসংকোচে ঢেলে দেয় প্রাণের আগুন—
জানি তারা মহাপ্রাণ, পৃথিবীর নমস্য তাহারা;
তাদের জীবনগানে মুখরিত হবে জানি
ভারী ইতিহাস,
দেশে দেশে আজ তারা বিপ্লবী সৈনিক।

মনে রেখো তবু আমাদের—
ক্ষয়ে গেছি, গলে গেছি, হাত তবু ছাড়েনি লাঙ্গল
মাঠে মাঠে কঙ্কালের মুঠো আছে ঠিক,
মারীঝড়ে ছিঁড়ে গেছি, ভুলি নাই তবু সেই গান
আমাদের দিও শুধু সেই সব মানুষের মৃত্যুর সম্মান।
কঙ্কালের কথা কেউ শুনিয়াছে কিনা
সে কথা জানি না।
শুধু জানি ওরা সব শুধে গেছে দেনা
আমাদের দিয়ে কিছু যায় নাই ঋণ।
এই তো সেদিন শুধু, সে কাহিনী হয়ে গেছে একান্ত প্রাচীন।

জনযুদ্ধ, ১৩৫০

সুশীল রায়

অ র ণ্য রো দ ন

নিতান্ত নির্বোধ তাই মালাকার—কুটীরে তল্লাস
করি মৃত লাশ;—
যদি তার নিস্তব্ধ নিশ্বাসে
এখনো কয়েক ফোঁটা যাদু ভেসে আসে।
ছড়ানো ছিটানো সেথা শোলা আর ছুরির জঞ্জাল
শূন্য ঘর পড়ে আছে—বীভৎস কঙ্কাল।
প্রবল তাগিদে
দ্রুতগতি চলিলাম সিধে
গ্রাম ছেড়ে গ্রামান্তরে বহু দূর পটুয়া পাড়ায়—
অগণ্য রঙের ভাঁড় তুলিচ্ছিন্ন একাকী গড়ায়
পথের নিভৃত প্রান্তে; মালিকত্বহীন
তুলি পড়ে আছে দূরে ধূলায় মলিন।
সবংশে নিহত বন্ধু পটুয়া প্রধান
চৌদিকে চাহিয়া ধূ ধূ হেরিলাম শিল্পের শ্মশান।
ফিরিলাম ব্যর্থকাম, চলিলাম লাজনম্র শিরে
যেখানে মাটির ডেলা জেগে ওঠে রূপের শরীরে।
এখানে একদা ছিল শিল্পপ্রাণ অজস্র মানব
আজ শুধু পড়ে আছে শব।
পুরানো কাঠামোগুলি পড়ে আছে বীভৎস চেহারা
মাটির প্রলেপ এতে দিবে যারা, কোথা আজ তারা?
তোমাকে সাজাবে যারা
আজ নাই বলে তারা
অতএব মিথ্যা কেন শোক?
সমারোহহীন পূজা বিড়ম্বনাহীন আজি হোক।
যে বাঁধিবে কাঠামোটা তার ঘরে হানা দেয় যম
চক্ষুদান যে করিবে অনাহারে সে আজি খতম।
স্বহস্তে সদলবলে তাই আজি খড়ে ও দড়িতে
ভক্তি গদগদচিত্তে রত আছি তোমাকে গড়িতে।
নেহাৎ আনাড়ি হস্তে হয় যদি কোন ভুলত্রুটি
সজল মিনতি রেখো ঃ ক'রোনা ভ্রূকুটি।

দারুণ দুর্ভিক্ষ আসি উহাদের করেছে হরণ,
আমরা জীবিত যারা এ-মৃত্যু যে তাদেরি মরণ।
রসালের কলিগুলি নিয়ে গেছে চতুর আকাল,
শাখায় শাখায় দোলে ক্লেদগর্ব্ভ সৌখিন মাকাল।
বোধন বাজিছে দূরে—কান্নাক্লান্ত জাতীয় রোদন-
এ-বিকৃত সুর আজ কার স্পর্শ করিবে শোধন?
বাঁশিতে ফুঁ দিবে যারা তারা আজ নাই
অক্ষম ফুঁয়ের জোরে বাজে তাই বেসুরো সানাই।
সহায় সম্বলহীন আমরা নিয়েছি আজ ভার
নিজ হস্তে বাঁশি বাজাবার।

শারদীয় দেশ, ১৩৫০

নীলরতন দাশ

দু র্গ তি - মা ঝে এ স মা দু র্গে

প্রলয়ংকরী তিমির রাত্রি নেমেছে ধরণীতলে,
বিশ্ব ব্যাপিয়া সৃষ্টি বিনাশী প্রলয়-বহ্নি জ্বলে।
এবার সবার মরণোৎসব, আর্তকণ্ঠে ওঠে কলরব;
আজি এ শ্মশানে বোধনের দিনে জাগো মাতা দশভূজা,—
শব সাধনায় তুষিব তোমায় সঁপিয়া ব্যথার পূজা।
হস্তে তোমার বরাভয় ল'য়ে এস মা গো অম্বিকা,
দুর্গত তব ভক্তের ভালে এঁকে দাও জয়টীকা।
মঙ্গল কর পরশে তোমার, ঘুচাও অশুভ অশিব সবার;
মহামারী আর অন্নাভাবের অসুরে করিয়া জয়,—
দুর্গতি-মাঝে এস মা দুর্গে, নাশিতে দৈন্য-ভয়।

বসুমতী, ১৩৫১

শামসুদ্দীন

ন তু ন চো খ

তোমরা মরিয়া গেছ; প্রেত চলে শুধু
জীবন্ত কংকাল সাথে; তোমাদের গান
মূক আজি; স্বর্ণ বঙ্গ মরুভূমি ধূ ধূ;
শৃগাল বাঁধিছে বাসা—আঁধার শ্মশান।

নদী সে ভুলিয়া গেছে সাগরের তান,
পাখীর কূজন নাই মাধবী-লতায়,
সকলের হাসি অশ্রু—যত অভিমান
নিঃশেষে মিলায়ে গেছে বারুদ ধোঁয়ায়।

কুয়াশা বিদায় নেছে, মেঘ ভুলিয়াছে
বর্ষণ-মুখর রাত, ঘোর অন্ধকার
তোমাদের পথ,—তবু সবে ছুটিয়াছে
আলেয়ারে ধরি। হায়, দিন জাগিবার—

এখনো আসেনি কি গো? তোমাদের চোখ
কখন দেখিবে পুনঃ নতুন আলোক?

বসুমতী, ১৩৫১

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

মা টি

মাটি হতে নিয়ে গেছে যাযাবর মানুষেরা যব আর ধান
কিছু তার ফেলে গেছে পথে কিছু সমুদ্রের জলে,
তারপর মরুভূমি বেয়ে চলে মানুষের ক্লান্ত ক্যারাভান
কোথায় কুমারী মাটি ভারাতুর আসন্ন ফসলে।

প্রাচীন মাটিতে আজ ভাঙা হল, ভুসি আর পশুর কঙ্কাল
হে রাজা, তোমার আয়ু নিভে যায় আগন্তুক ঝড়ে,
শতচ্ছিন্ন উত্তরীয় ওড়ে, ম্লান উষ্ণীষে পড়েছে ঊর্ণাজাল
তোমার সীমান্ত ছেড়ে যায় প্রজা বিদেশী নগরে।

নগরের দীর্ঘদেহ আকাশে পাঠায় বুঝি আলোর সঙ্কেত
মাটির ছেলেরা আসে পতঙ্গের মতো প্রলোভনে
বহু দূরে ফেলে স্তব্ধ অন্ধকার আর বন্ধ্যা ফসলের ক্ষেত
যেখানে অনেক রাজা বসেছে সোনার সিংহাসনে।

এ নূতন রাজধানী—ধমনীতে চলে তার বিদ্যুতের স্রোত
লোহার ফসল হয় রক্তে আর ঘামে শুধু বোনা,
বন্দরের ঘোলা জলে কোলাহল করে বহু বণিকের পোত
এখানে খনির মাটি ইন্দ্রজালে হয়ে যায় সোনা।

তবু কোনো রাত্রিশেষে তরুণ সূর্যে দিকপ্রান্ত লাল
তারা কি দেখে নি স্বপ্ন মাটি ছেড়ে এলো যারা চলে—
উর্বর করেছে মাটি তাদের দেহের স্তূপ বুঝি কতো কাল
তারপর পৃথিবীকে পেল তারা মাটির বদলে।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

মে ঘ মু ক্ত

বিধ্বস্ত শহরপ্রান্তে; বিনষ্ট মৃত্তিকা
জ্বালে শেষ সংক্রান্তির শিখা
আপন উদরে। পথে-পথে লোক কম, হাট জনহীন,
ধূমাঙ্কিত দিগন্ত মলিন।

তবুও বিস্মৃতপ্রায় জীবনকে হাতছানি দিই।
এখানে প্রাকারে
সবাই নির্ভীক রক্ষী, বিনিদ্র প্রহরী;
সংকল্প স্বদেশ রক্ষা. তাই বারে বারে
দৃঢ়মুঠি উর্ধ্বে তুলে ধরি।

নিরন্ন বাংলায় এলো ব্যাধি, মৃত্যু, দুর্ভিক্ষ প্লাবনে
উজাড় হাজার গ্রাম, শূন্যক্ষেত আয়োজন-হীন—
স্বদেশ রক্ষার ডাকে উত্তোলিত আমার সঙীন।
দুর্ভিক্ষে উজাড় দেশ, তদুপুরি আজো পরাধীন।

পরাধীন কিন্তু গৃধ্নু ক্রীতদাস নই—
সবুজ শস্যের ক্ষেতে সূর্য ঢালে সাতরঙা আলোক মসৃণ,
সর্বত্র ক্ষুধা ও মৃত্যু মড়ককে রুখে
শুরু হোক্ আমাদের দিন।
আমার সম্মুখে আজ প্রসারিত জীবনের দিকচক্রবাল
তারে ঢেকে দিতে চায় দস্যু পঙ্গপাল;
দুর্ভিক্ষ মড়ক আসে,
দন্তপাটি খুলে দস্যু হাসে,
মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে ছিন্ন করি ষড়যন্ত্র জাল।

গ্রামে গ্রামে সেবাকার্য করি। বলি যতো দুর্গতকে ডেকে
একতাকে শক্তিশালী করো;
ব্যাধি ও দুর্ভিক্ষরূপে আসে কিন্তু শত্রুর বাহিনী
তারি সাথে প্রাণপণে লড়ো।

দুর্ভিক্ষে উজাড় দেশ, আজো পরাধীন,
সর্বাঙ্গে আঘাতচিহ্ন, রক্তক্ষত আমাদের দিন।
পরাধীন, কিন্তু গৃধ্নু ক্রীতদাস নই—
সর্বত্র ক্ষুধা ও মৃত্যু মড়ককে রুখে
আমরাও প্রাণে জয়ী হই।

নতুন সূর্যের আলো কুয়াশাকে ভাঙে, আনে আশার চেতনা
বিধ্বস্ত জীবনে, দীর্ণ যুগান্তের ম্লান ইতিহাস—
কান পেতে শুনি নব পদধ্বনি আকাশে-বাতাসে।
চীনে, স্পেনে, লেবাননে সর্বত্রই সমতালে একই পদধ্বনি,
হৃৎপিণ্ড ঢেলে রক্ত দেয় সাধারণ
তারি হাতে বশীভূত হবে কাল তিমির রজনী।
পথ আজ সমাকীর্ণ শবে, শবাধারে।
শূন্য মনে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ, বশে ও বিকারে
তবু গিয়ে নাহি যেন পড়ি কারো ষড়যন্ত্র জালে;
ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষ থেকে সযতনে দূরে রাখি জীবনের ম্লান বার্তিকারে।

অশ্বিনীকুমার পাল

ম ন্ব ন্ত র

দুর্ভিক্ষে পীড়িত সর্বদেশ
ক্ষুধায় ক্ষয়িষ্ণু তনু পথ-পাশে পতিত অশেষ।
পথ নহে! মানুষ গিয়েছে মরে—শুধু মৃত মানব-কঙ্কাল
পথে ঘাটে পড়ে আছে আজি এই তেরশ' পঞ্চাশ সাল।
শুধু রক্ত মাংসহীন
নরদেহ; বক্ষপুট নিঃশ্বাস বিহীন;
দিন দিন অন্নহীন
দিন দিন আয়ুক্ষীণ;
পলে পলে পচে গলে পড়ে তনু তল।
মানুষের মর্মে বসি নাচে মৃত্যু করি কোলাহল।
বিশাল বিপুল এক শ্মশানের ভয়ংকর রূপ—
বহ্নিভস্ম গৃহসম কালো দানবের মত দাঁড়ায়ে নিশ্চুপ;
মহা-মৃত্যু মহা-অন্ধকার,
স্তিমিত ভয়ার্ত রবে চারিদিক করে হাহাকার।

মহা-মন্বন্তর
নিশ্চিহ্ন করেছে হায় বঙ্গ-বংশধর।
মানুষ যে আর নাই,
মানব আবাসে বন্য শৃগাল কুক্কুর এসে নিয়েছে রে ঠাঁই।
জন-শূন্য সব ঘর-বাড়ি,
বিষাক্ত বাতাস শুধু গৃহদ্বারে কেঁদে মরে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি;
শুধু মৃত নর-গন্ধ চারিদিক হতে ভেসে আসে।
অরণ্য-আবাসে
পড়ে থাকে মৃত পশু-দেহ-ভ্রষ্ট কঙ্কাল অশেষ
তেমনি হয়েছে বঙ্গদেশ—
ক্ষুধা মৃত্যু মানবের কঙ্কালের অরণ্য-সদন;
নিবে গেছে জীব শিখা; জ্বলে শুধু করাল নয়ন।

বসুমতী, ১৩৫০

এফ· রহ্‌মান

বা স্ত ব

কিসের উৎসব
চারিদিকে হের আজি হে মানব
রণিয়া উঠিছে হাহাকার
শত শত বুভুক্ষুর বুক ফাটা দুঃখের ভার।

তব অঙ্গনতল
একদা ফুটিত যেথা শুভ্র পুষ্পদল
পরিমল লোভে যেথা আসিত মধুপ
গাহিয়া সঙ্গীত অপরূপ,
সেথায় উঠিছে ভাসি ধূ ধূ বালুরাশি
বাতাসে বাতাসে দুঃসহ বেদনা আসি
নিল ঢাকি সকলের মন
(তাই) জগত ভরিয়া এত ব্যথা ও বেদন।
ফাঁকির দামামা ওই বাজে,
মিথ্যা লয়েছে ঠাঁই সত্যের মাঝে।
লুকায়ে গিয়েছে যত খাঁটি ও আসল
প্রতি ঘাটে বিরাজিছে নকলের দল।
বিদায় নিয়েছে যে সব সরলতা
কেমনে উঠিবে সেথা উৎসবের কথা
কেমনে ফুটিবে হাসি ম্রিয়মান মুখে?
শীর্ণ জর্জরিত অন্নক্লিষ্ট বুকে
নাই আর সেই জোর সেই সে শকতি,
দুর্জ্জয় সিংহের হের শেষ পরিণতি।
বলীয়ান দেহটি তোমার
ধীরে ধীরে হয়ে গেল কংকালসার।
কতগুলি নিঃসহায় প্রেতাত্মার মত
নিরুপায় ঘুরিছ ফিরিছ অবিরত।
বুকের রক্ত দিয়ে যে সুধারে গড়
কেড়ে নেয় অন্যে তা, তুমি শুধু মর
অনন্ত পিপাসারে বুকে চেপে নিয়ে;
কাটালে উৎসব রাতি ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে।

তোমারি অর্জ্জিত ধনে নাই তব স্থান
মানুষ হয়েও হলে পশুর সমান।
নানা আর কভু নয়।
অসহ্য অন্যায় সহে কেউ না সময়।
উপাড়িয়া ফেল সব বাধার পাহাড়
প্রতিষ্ঠিত কর ন্যায্য দাবিরে তোমার।

নও-রোজ, ১৩৫১

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

ভি খা রি ণী

ওগো ভিখারিণী, দেখি আয়,
কি মিলেছে আজি ভিক্ষায়।
কত চাল মরি মরি,
চলেছে ঝুলিতে ভরি
এ-গাঁ হতে অন্য কোন্ গাঁয়?

একি হায় দেখি ভিখারিণী,
কাঁধে তো ঝুলিটা নাই!
কে বুঝি সুযোগ পাই'
একা পথে নিল তাহা ছিনি?

কেন তোর আঁখি ছলছল?
এখনি আপনি গিয়ে
থানায় খবর দিয়ে—
কি হয়েছে মোরে খুলে বল্।

হায় ভাগ্য, ছিন্ন সেই ঝুলি
করেছিস বুকের কাঁচুলি!
রাখিতে লাজের মান
ঝুলিটায় দিলি টান,
উদরের কথা গেলি ভুলি?

ভিক্ষা চাস, কাঁধে ঝুলি নাই,
দান যে দাঁড়াবে—কোথা ঠাঁই?
দ্বারে দ্বারে মুঠো মুঠো
দাক্ষিণ্যে করিনি ঠুঁটো
বালাই-এর উপর বালাই।

ভিখারিণী কারে তোর লাজ?
গিঠায়ে রাজ্যের কালি
ঢাকিয়া যৌবন-গ্লানি
নিরন্ন ফিরিছ পথে আজ।

ক্ষুধায় ছিঁড়িছে নাড়ী;
তবু জেগে ব'সে নারী
রক্ষা করে মানব-সমাজ।

মানবের লজ্জা আছে নারী?
পট্ট-বাসে দেহ ঘেরা
পাটনাই পেঁয়াজেরা
তোরে হেরে ফেলে অশ্রুবারি।
ভিখারিণী কথা রাখ্
বিবসনা হয়ে থাক্
যতদিন অন্ধ নাহি মোরা।
কারে লাজ, কোন ভয়?
তনু তোর গোরা নয়
নাহি তার কনক-কটোরা।
তোরি মত কালো মেয়ে,
রূপসী বা তোরও চেয়ে,—
হয়তো এমনি কোন দুখে
ফেলিয়া কটির বাস
হেসে উঠে অট্টহাস
পা দিয়ে দাঁড়াল শিব-বুকে।

তখন বিশ্বের লোক
চমকি মেলিয়া চোখ
আনে পূজা শত-উপচার
বলে—একি রূপরাশি
তিমিরে তিমির-নাশি!
দয়াময়ী তুমি মা আমার।
শুনে কালো মেয়ে হাঁসে
ভুবন ভরিয়া ত্রাসে
তাথৈ তাথৈ নেচে ধায়;
কপালের দুখ যত
অনল গিরির মত
কপাল ভাঙিয়া বাহিরায়।

দল-মল নৃত্য-ভরে
মালা ছিড়ে মুণ্ড পরে,
হানে অসি মাভৈঃ মাভৈঃ।
দু কানে দোদুল সুখে
কচি শিশু মরা মুখে
মার বুকে দুধ খোঁজে ওই।
মানুষের হাত কাটি
ঘাঘরা পরেছে আঁটি
কটির মিটিল বুঝি ক্ষোভ;
'ভুখা হুঁ', 'ভুখা হুঁ' বলে
খর্পর মুখে তোলে,
যত খায় তত বাড়ে লোভ।

ভিখারিণী, কথা শোন—
তুই যে রে তারি বোন;
প্রলয়ের জানিস সন্ধান।
ফেলে দে ফেলে দে টানি
ঘৃণ্য ওই চীরখানি
ও-লাজ নারীর অপমান

শনিবারের চিঠি, ১৩৫০

মোহম্মদ নওলকিশোর বোগরাবী

এ কি স্ব প্ন?

বঙ্গ-জননীর দ্বারে বৎসরান্তে এসেছে অঘ্রাণ
অঞ্জলী ভরিয়া তার আনিয়াছে স্বর্ণ-বর্ণ ধান
অফুরন্ত। ভাবিলাম উল্লসিত চিত্তে এইবার
ঘুচিল আমার কষ্ট, শূন্য জঠরেতে কিছু তার
পড়িবেই সুনিশ্চয়; হৈমন্তিক লক্ষ্মীর প্রসাদ
আমিও কিছুটা পাবো! একেবারে যাব নাকো বাদ।
অনাহার-শীর্ণ কর প্রসারি রহিনু প্রত্যাশায়—
আনন্দ-আবেগে মোর চক্ষু দুটি নিমীলিত প্রায়।
কতক্ষণ কেটে গেলো! চেয়ে দেখি সেই ধান্য হায়,
স্তূপে স্তূপে শোভিতেছে লক্ষ লক্ষ আড়তে-গোলায়।
মোর হস্ত শূন্য রিক্ত পূর্ববৎ, শুধাইনু তারে—
হেমন্ত-লক্ষ্মীরে ডাকি, কোথায় মা? তুই যে আমারে
কিছু দিলি নাকো! একি, দেখি মোর সম্মুখেতে নাই
লক্ষ্মীর সে মূর্তিখানি! শূন্য চতুর্দিক ব্যাপিয়াই।

বসুমতী, ১৩৫০

অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

ভো রে র বে লা

গাঁয়ের ধারে প্রাচীন তরু দোলায় স্মৃতির ঝুরি,
নতুন পাতায় জাগছে ভোরের আলো।
বালুর তটে দাঁড়িয়ে দেখি এই যে শ্মশান-পুরী,
মনের আকাশ এই তো করে কালো!
বনের বুকে পাতায় ঢাকা পথ যে গেছে ঘুরে
লোকালয়ের জীবন-অবসান।
আশাবরীর সুরের খেলা হারিয়ে গেছে দূরে,
বৈরাগীদের নেই কো টহল গান।
জাগরণের নেইকো সাড়া হেরি মরণ ঘুম
ফুটছে ভোরে ব্যথার শতদল।
নদীর সাথে গাঁয়ের সদা কোলাকুলির মধু
নেইকো বলে ঝরছে আঁখিজল।
মধ্যযুগের সতীর শাঁখা ভাঙা বটের মূলে
ঘন ছায়ায় দেউল ভাঙা ইট;
দু'শো বছর পেরিয়ে এসে মরা গাঙের কূলে
প্রাণ হারালো পল্লীমায়ের পীঠ।
আকাশ পানে ধায় যে পাখী শূন্য করে মন
সে কি আবার ফিরবে হেথা ভাবছি অনুক্ষণ!

প্রবাসী, ১৩৫০

দুঃ স ম য়ে

আনন্দের রুদ্ধ গতি, প্রাণের অংকুর এবে আপনারে করে না প্রকাশ
আছে কি স্থিরতা কিছু যাবে দূরে একদিন আজিকার অশ্রু জলোচ্ছ্বাস!
এখনো কি আছে আশা কম্পিত কুণ্ঠিত মোর জন্মভূমি লভিবে বৈভব!
জীবন-ঐশ্বর্য্য পাবে ঝঞ্ঝা-রাত্রি-অবসানে লক্ষ্মীহীনা শূন্য পুরী সব?
পান্থের নয়ন 'পরে ভবিষ্যের বৈজয়ন্তী উড়িবে কি সূর্য্যকরঘাতে?
সেদিন শারদ-প্রাতে হাসিবে কি শতদল ভাস্করের কিরণ-সম্পাতে!

পুষ্পফুল্ল নহে পথ, আজি তার প্রান্তে হেরি বিনিদ্রিত প্রেমতীর্থ বট!
সুখের সৌরভ কোথা? দুঃখের বিকট গন্ধ সংসারের শবাচ্ছন্ন তট।
রোষ-দীপ্ত বিভীষিকা রাত্রির বীভৎস ছায়ে স্পর্ধা ভরা হিংসার আবেগে
স্তব্ধতার বিস্তৃতির স্তরে স্তরে সভ্যতার আনে মৃত্যু-শঠতারে ডেকে।

গৃহচ্যুত নর-নারী, শঙ্কিত ক্ষুধিত প্রাণ, দেবতা যে কঠিন পাষাণ,
ন্যায়ধর্ম অরক্ষিত, অন্যায়ের সমাদর, সবলের আছে শুধু স্থান!
শতাব্দীর রুদ্র রূপ অদৃষ্টের পরিহাস! ঘরে সদা শোকের শেফালি,
ত্রাণকর্ত্তা আসিবে কি! শ্মশানের পথপ্রান্তে দিব তারে কঙ্কালের ডালি।

বসুমতী, ১৩৫০

মতিউল ইসলাম

এ খা নে

চির পরিচিত এই পৃথিবীর ঊষর মাটির পরে,
ধূলায় ধূসর ক্লান্ত আঁখির অগ্নি উৎস ঝরে।
নিত্য এখানে নগ্নাচারীর পোষাকী—প্রবঞ্চনা,
ফাঁসি দিয়ে মরে নিঃস্বতমের ক্ষুদ্র আশার কণা।
এখানের বায়ু বিষে বিষে নীল বিষাক্ত নিঃশ্বাসে,
আঙিনার ফুল শুকায় অকালে দগ্ধ দিনের ত্রাসে।
তীব্র ব্যথায় কাৎরায় হেথা লাল করবীর ফুল,
চোখে চোখে আর বুকে বুকে ফোটে নিত্য তীক্ষ্ণ হুল।
ফলেছিল কবে সোনালী ফসল স্বর্ণ-শীর্ষ তুলি,
ভুলে গেছে সেই বিশাল স্বপ্ন বর্বর মাঠগুলি।
লাঙলের ফালে মরিচা ধরেছে আর মানুষের মন
ফাটা জোয়ালের ফাটলের তলে গোঙায় অণুক্ষণ।

জানিনা কখন উড়ল আকাশে শুভ্র হংসরাজ,
সিন্দবাদের পণ্যশালা যে শূন্যই দেখি আজ
প্রেত উল্লাসে ঘোরাফেরা করে কুৎসিত কঙ্কাল,
গন্ধ বিলাসী মনের মুকুল চিতার আগুনে লাল।
মাঠের ফসল পুড়ে যায় বুঝি, পোড়ে মানুষের মন,
নিভে নিভে যায় বিদ্যুৎ ভরা আলোর আলিম্পণ।
পড়ে থাকে শুধু গোরস্থানের ক্ষুব্ধ তপ্ত-বালি,
শাদা কাফনের ভাঁজে ভাঁজে কাঁদে শিশু চাঁদ এক ফালি।
দগ্ধ মাঠের বুকে আসে ফের বন্য বন্যা জল,
ভাসে জীবন্ত কঙ্কালগুলি, ভাসে সব সম্বল।
সারাদেশ ভরে ওঠে হাহাকার দুরন্ত দুর্বার,
মানুষের বুকে বল্লম হানে—মানুষ বারম্বার।

সওগাত, ১৩৫০

শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

তে র শ' প ঞ্চা শ সা ল

মহাকাল বর্ষ চক্রে খুলে দিল ধরণীতে দ্বার——
এল ঐ তের শত পঞ্চাশ এবার।
পিছনেতে কত বর্ষ উল্লাসেতে দুঃখে হেসে কেঁদে
পড়ে রয় তপ্ত ধূলিতলে,
তারি কঙ্কালের 'পরে বজ্র-করে অশ্বে কশা বাঁধি,
মানুষের মহাপাপে দুই চোখে রোষে অগ্নি জ্বলে,
তেরশ' পঞ্চাশ এল গর্জি বারে বার;
অট্টহাসি হেসে কাল নিজ হস্তে খুলে দিল দ্বার।
সহে না একটু ত্বরা হুঙ্কারিয়া ডাকে বারে-বারে,
—পাপমগ্ন নর-নারী যাত্রা পথে হুঁশিয়ার!
কিম্বা আজি খাড়া হও মৃত্যু বরিবারে।
সহস্র বৎসর ধরি' জমিয়াছে পাপের পাহাড়,
মহাকাল আছে সাক্ষী তার।
মিথ্যা কথা, হিংসা আর প্রতারণা ভ্রাতায়-ভ্রাতায়,
আত্মসুখে পরদ্বেষে এই বসুধায়
স্নিগ্ধ মাটি তপ্ত হলো প্রতিদিন প্রকাশ্যে-গোপনে,
রক্তভরা কল্লোলিত তার ইতিহাস টগবগ করে সদা মনে।
কতনা লজ্জার বাণী গুপ্ত হয়ে কাঁদে নিশিদিন,
সেই সব পাপ দিয়ে বাজাইয়া বীণ,
উল্লাসে নাচিয়া চলে ভদ্রবেশী বর্বরের দল,
ধণিকের বণিকের পাপে বিশ্ব করে টলমল,—
গির্জায় মন্দিরে মঠে পণ্যশালে প্রাসাদের তলে,
নিত্য নাচি পাপস্রোত চলে।
ধরিত্রী বহিতে আর পারে নাকো এ পাপের ভার—
তাই আজি মহাকাশ অট্টহাসি হেসে
খুলে দিল নববর্ষ-দ্বার।
সেই বর্ষ-দ্বার দিয়ে তেরশ' পঞ্চাশ এল
যুগান্তের সে যে মহাদূত,
সম্মুখে প্রলয় তার, পশ্চাতে সৃষ্টির জ্যোতি—
হাহাকার আর্তনাদ দুইটি নকীব ফুকারিছে সঙ্গে অদভুত।

মানবের নরজন্ম মরণের মহাসন্ধি আজি,
পঞ্চাশী বৈশাখ সাথে এল তাই দুর্ভিক্ষ মড়ক,
লোল জিহ্বা করে লক্‌লক্!
অগ্রসঙ্গী মহারণ রক্ত দিয়া ধৌত করে দ্বার,
গর্জিতেছে অনশন ঊর্ধে-নিম্নে হাঁকে দৈবরোষ,
রক্ষা নাই, রক্ষা নাই আর!
চারিদিকে ঘিরে তার আধিব্যাধি দৈন্য মহামারী
হুঙ্কারিছে সর্বনাশা ভয়,
সকল নিগ্রহ আর সমস্যার রুদ্র সমাধান—
তারি অগ্নিকুণ্ডে দাহ হইবে নিশ্চয়।
তারপর?—পড়ে' রবে দগ্ধ কোটি নরের কঙ্কাল—
স্তূপাকার ভস্ম-অবশেষ!
সেই মহাভস্ম 'পরে বিশ্ব যারা মহা-ভাগবত,
তাহারা বাজাবে বীণ,
তাহারা রচিবে পুনঃ ধরণী নবীন,
গঠিবে নূতন করি নর-নারী নব পুণ্যদেশ।
এস তবে নমো নমো তেরশ' পঞ্চাশ সাল,
ধ্বংসের কুঠার দিয়া ভাঙ্গি এই পাপ-রাজ্য রুদ্র আশীর্বাদে
ভাবী পুণ্য ধরণীর পথ তুমি করো এসে শুরু!
হে রুদ্র বিরাট ঘায়ে সাফ করো সকল জঞ্জাল—
সেই পথে আসিবেন ত্রাণ-বার্তা নিয়ে ত্রাণগুরু।

বসুমতী, ১৩৫০

সৈয়দ আলী আহসান্

নূ ত ন সূ র্যে র দি ন

মনসুর
জানি, জানি সমস্যার কণ্টকেতে জীবনের পথচলা হয়নি সুস্থির,
মুক্তির লাবণ্য নাই, দীপিত দিনের ছবি মৃত্যু লাগি হয়েছে অধীর;
প্রশান্ত অভয় নাই, লাঞ্ছনার দিনগুলি ঘনায়েছে কাছে
আকাশে স্বপ্নের রেখা কালো হয়ে আছে,
মদির রাত্রের মায়া হায় প্রিয়া আজ হল ভুল
পার্থিব সম্পদগুলো হইয়াছে খুব অপ্রতুল।
রওশন
জানি, জানি, মৃত্যুপথে মিথ্যা হ'ল মুক্তির আস্বাদ
প্রণয়চুম্বন গুলি ঠোঁটের আগুনে আজ লেগেছে বিস্বাদ;
মিথ্যা আজ মুহূর্তের উল্লাসের কণা,
সমস্যার ক্রোড়পত্রে স্বাক্ষর যোজনা
তোমারে করেছে ক্লান্ত। ভ্রান্ত আজ স্বপ্নলব্ধ দিন
মিথ্যা দীপ্ত সে-প্রহর—অযথা রঙিন।

মনসুর
তাই আজ নামিয়াছি জনতার সাথে
বিমর্ষ পথের প্রান্তে। রাখি হাত হাতে
উপরে তুলেছি শির। সোনার তুলির
গতায়ু উজ্জ্বল টানে দিবস মদির
হয়েছিলো একদিন; ব্যথার আঁচড়
মনের মাটিতে আজ গড়েছে শিকড়।
তবু মনে হয়, যদি বেদনার মীড়
বৃন্তের কণ্টকে আনে উল্লাস নিবিড়—
অনাদ্যন্ত মুক্তির সাধনা, তবে প্রিয়া
আমার অশ্রুর স্বর্গে হাস্য উচ্ছ্বসিয়া
এনে দিয়ো প্রাণময় সুরভিত দিন
বসন্তের দিনগুলি কোরো ক্লান্তিহীন।

রওশন

কিন্তু আজ ব্যর্থ, ব্যর্থ, প্রণয়ের সকল কৌতুক
ধূলায় মিশেছে আজ মিলনের অজস্র কৌতুক,
সকল বন্ধনহীন, উন্মত্ত অধীর দিন আনেনি আবেশ
মৃত্তিকার বক্ষ হতে মুছিয়াছে বন্ধু জানি কল্পনার রেশ।
ধনীর সভ্যতা আজ মোদের মাটিরে বন্ধু করেছে শ্মশান
আমরা পেয়েছি শুধু বুভুক্ষার শুষ্কদীপ্তি—মরণের দান;
তাই আজ ভুলিয়াছি প্রাণপূর্ণ রাত্রির প্রহর
রক্তজ্বালা বক্ষে নিয়া কাঁদিতেছে নিরন্ন নগর।
ক্ষীণকটি বেষ্টনের উদ্যত উজ্জ্বল বাহু প্রসারিয়া সম্মুখের দিকে
কঙ্কাল-সারথী আজ মানবেরে টানিতেছে মৃত্যুর সম্মুখে।
দেহের কাঞ্চন-প্রভা আজ মিথ্যা হোক্ বন্ধু,

এ দিকেতে দিয়ো না নজর,
মায়ার মাটিতে দেখ তীক্ষ্ণ হয়ে জ্বলে আছে
কঙ্কালের সুতীক্ষ্ণ আঁচড়।

মনসুর

নিঃশেষে ঝরিয়া যাক্ জীবনের কণা—
তাহাতেও সত্য আছে। যারা অন্যমনা,
অনাকাঙ্ক্ষ, মৃত্যুর দোসর—তাহাদের
অতীতের ক্ষেত্র হ'তে জীবন স্বপ্নের
ব্যাকুল মুক্তির কথা করেছে মধুর
দৈন্যপথে টেনে আনা ব্যথিত মৃত্যুর
অচঞ্চল ক্ষুদ্রকায় ছবি। বাণীহীন
মৃত্যু বহু ভালো। যারা আজ বাক্যদীন
এ পৃথিবী তাহাদের নয়; তাহাদের
মৃত্যুই কল্যাণকর। নির্জীব মনের
প্রশান্ত স্থিরতা হ'তে অগ্নির লেহন
আসিবে না কভু—জানি, জানি এ-লেখন
বণিকের ইচ্ছাক্ষেত্রে দীপ্ত হয়ে আছে,
এ-সমাপ্তি চিরদিন তারা যাচিয়াছে।
তবু, তবু, এর চেয়ে সত্য পাব কোথা?

রওশন

বুভুক্ষুর দ্বারপ্রান্তে কাঁদিছে দেবতা—
নির্জীব পথের ধূলি তুলি তারে আজ অর্ঘ্য দাও;
অথবা প্রাণের কণা মরণে মিশাও।
দেবতার প্রয়োজন আর আজ নাই
সৃষ্টিতে তাহার দাবী মুছিবারে চাই।
মৃত শিশু বক্ষে তুলি রিক্তা মাতা জ্বেলেছে আগুন
মর্মরিত শুষ্কপত্রে নিষ্ঠুর ফাগুন
নবতম জীবনের আনেনি নির্দেশ,
দলিত পুষ্পের দলে মধুর আবেশ
বহুপূর্বে মরিয়াছে। আছে তিক্ত প্রাণবীজগুলি
গর্ভের কোটরে তারা ভ্রূণ হ'য়ে এ জীবনে
এনেছে বিভ্রম,
বুভুক্ষু মাতার গর্ভে নবপ্রাণ আর্তনাদ তুলি'
বাখে নাই জননীর প্রদীপ্ত সম্ভ্রম।
তাইতো উড়ায়ে দিয়া পথের ধূলায়
সভ্যতার দানগুলি, মৃত্যুর কুলায়
পথ লইয়াছে খুঁজি। শতাব্দীর সূর্য্যকররাশি
বাতাসে ভাসায়ে আনে কঙ্কালের তীক্ষ্ণ শ্বেত হাসি।
এ মুহূর্তে কি কর্তব্য?

মনসুর

রক্তিম নিশান
বহু হাতে উড়িয়াছে। জীবন-শ্মশান
তবুও গোধূম-ধান্যে পরিকীর্ণ নয়,
তবুও প্রাণের দাবী মিথ্যা মনে হয়।
মরে যাক মরে যাবে যারা। বাক্যহারা
কেন তারা, আজিকার প্রশ্ন তো ইহাই।
ধনীর দুয়ারে তারা কাঁদিছে বৃথাই
একমুষ্ঠি অন্ন লাগি। সান বাঁধা ঘরে
তাহাদের আকুলতা বাধা পেয়ে মরে।
ইহাদের মুখে যদি দিতে পারি ভাষা
তবেই মিটিতে পারে সকল পিপাসা।
নয়, নয়, তৃপ্তিতে মগন—সচেতন

হোক তারা স্বাধিকার সবারে জানায়ে,
উধাও রক্তের রেখা বাতাসে ভাসায়ে
হাতে তারা তুলে নিক, প্রদীপ্ত সঙ্গিন
তখন উজ্জ্বল হবে মৃত্যুময় দিন।

রওশন
নতুন সূর্য্যের দিন জ্বলিবে তখন;
নতুন উচ্ছ্বাস আর প্রাণ অগণন
নতুন পথের প্রান্তে সত্য হয়ে উদিবে আবার
রুদ্ধ হবে সশঙ্কিত অঙ্গনের দ্বার॥

সওগাত, ১৩৫১

নকুলেশ্বর পাল

কা ল - বৈ শা খী

উড়াইয়া জটা কাল-বৈশাখী
আসিতেছে মহাকাল!
ডমরু বাজিছে, চারিদিকে তাই
মৃত্যুর কঙ্কাল।
রুদ্রানী নাচে তাথৈ তাথৈ;
বরাভয় করে ডাকিছে মাভৈঃ;
অট্ট-অট্ট খল-খল হাসি
জ্বলিছে অনল-জাল;
ঐ আসিতেছে কাল-বৈশাখী
মৃত্যুর মহাকাল!
শ্যামের অধরে মুরলী বাজে না—
আজি সে চক্রধারী!
দুন্দুভি বাজে মহা-প্রলয়ের
গাণ্ডীব টঙ্কারি!
চারিদিকে শুধু জ্বলিছে অনল,
বজ্র নিনাদে ধরা টলমল!

বাঁশী ছেড়ে তাই প্রলয়ের অসি
ধরিয়াছে শ্রীমুরারি!
প্রলয়ের বেশে কাল-বৈশাখী
রুদ্র অনল তারি।

গৌরী মায়ের কণ্ঠে কেমন
দুলিছে মুণ্ডমালা!
ত্রিনয়নে জ্বলে ধ্বক্ ধ্বক্ ধ্বক্
আগুনের শিখা-জ্বালা!
নয়নেতে নাই স্নেহ-নির্ঝর;
বহিতেছে মহা প্রলয়ের ঝড়;
সম্বর মাগো মুরতি ভীষণ
নেত্রে বহ্নি ঢালা!
সৃষ্টির সুখে উঠুক নাচিয়া
কিশোর নন্দলালা!

বসুমতী, ১৩৫০

প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

যুদ্ধ-দানব

দানব নাচিছে দিকে দিকে আজ দলিয়া ধরা
কাঁদিছে জননী কাঁদে শিশু ওই হাস্যভরা
কাঁদে সুখী গৃহী ভগ্ন ভবনে,
কেঁদে যায় দুখী অন্ন বিহনে,
ভেঙে পড়ে যায় পূজার দেউল পুণ্য-করা।
দিকে দিকে আজ মাতিছে দানব,
গুঁড়া হয়ে যায় নিরীহ মানব,
ভীম ভৈরবে দানব নাচিছে শান্তিহরা।
সোনার ধরণী করিছে শ্মশান,
জ্ঞান-মন্দির পড়ে খান খান,
বিদ্যারে আজ দলে অবিদ্যা ভয়ংকরা।
শোভনা ধরণী সভয়ে ঝিমায়,
আঘাতে প্রহারে দেহ ভেঙে যায়,
জীবের ধাত্রী জীবনাশে আজ কম্প-জ্বরা।
কে রয়েছে বীর দানব-দলন,
এস তুলি' শির শঙ্কাহরণ,
এস হে শৌর্য্যে এস হে বীর্য্যে দৃপ্ত-করা।
দানব দলিতে বীর গৌরবে এস হে ত্বরা।

প্রবাসী, ১৩৫০

পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়

হও দীপান্বিতা

অনশনক্লিষ্ট তনু বিবর্ণ পাণ্ডুর,
লাবণ্য মুছিয়া গেছে লোল নিষ্পেষণে,
অবলুপ্ত রক্তিমাভা পক্ক বিম্বাধরে,
সুজলা সুফলা নহ, শ্যাম-বিনম্রতা
উঠিয়াছে রুক্ষ হয়ে ঊষর মরুর
রূঢ় স্পর্শে; অন্ধকার নেমেছে গগনে;
পান করি তপ্ত রক্ত, এতদিন পরে
হ'লে আজ ছিন্নমস্তা, আঘাত-বিক্ষতা।

একদিন ছিলে তুমি ভুবনমোহিনী,
রূপে নিরূপমা. আজ ভীমা ভয়ংকরী;
আসন্ন প্রলয়ক্ষণে কণক-কিঙ্কিণী
বাজে তব, রুদ্ররঙ্গে, প্রকম্পিত করি
দশ দিক ক্ষণে ক্ষণে; জ্বলিয়াছে চিতা:
সার্থক আলোকে তুমি হও দীপান্বিতা।

শনিবারের চিঠি, ১৩৫০

শাহেদা খানম

নবীন স্বপ্ন চাহি

কি স্বপ্ন দেখ হে কবি আজিকে শুনিতে চাই,
তিমির রাত্রি, আকাশে চাঁদিমা আর ত' নাই।
শুকাইয়া ফুলদল
ভরিছে ধরণীতল।
বুলবুল পিক কণ্ঠ হারায়ে নীরবে আছে।
নূতন স্বপন দেখার সময় এল যে কাছে!

কোথা বসন্ত? আজি পৌষের হিমানী ক্ষরে,
সারা শ্যামলিমা লভিছে মরণ তুষার ঝরে।
জীবন নদীর ধারা
চলার স্বপন হারা
জমাট তুহিনে বন্দী হইয়া মরণ যাচে।
হে কবি, নবীন স্বপ্নের ক্ষণ এল যে কাছে।

মলয় মারুত দখিণ পবন নাহি ত' আর,
নিঃশ্বাস ভর অভাব আজিকে বায়ু-কণার।
বাস্তব হল ভুল
কল্পনা সমতুল।
নূতন খাতার পাতায় লেখহ নবীন গান,
মৃত্যুর মাঝে মহাজীবনের এ চির দান।

কাঁদিছে ক্ষুব্ধ মানবতা শোন দুয়ারে তব,
হে কবি, আজিকে রচিবে না তুমি কাব্য নব?
কতনা নিশাস বৃথা,
মিশিছে কি জানি কোথা,
তাহারি হিসাব নিতে হবে আজি ছলনা নহে,
কোথায় শান্তি? সকল ভুবন অনলে দহে।

ফাল্গুন দিন, চাঁদিনী যামিনী কোথায় আজি!
কোথা বেণু-বীণা, ওঠে ধ্বংসের মাদল বাজি।
ডঙ্কা বাজিছে শোন,
নূতন স্বপন বোন!
কাজল আঁখির মায়ার বারতা হয়েছে মিছে,
কাঁদে অগণন ক্ষুধিত আত্মা শোন কি পিছে?

সারা পৃথিবীর জঠরে জ্বলিছে দারুণ ক্ষুধা,
আছে হলাহল অশান্তি শুরু, নাহিক সুধা।
মন্থন চলে আজ
নহে সমুদ্র মাঝ
জীর্ণ-পৃথ্বী-পঞ্জরে বসি দানব যত,
সব নিঃশ্বাস, সব আলো-প্রাণ হরণে রত।

শান্তির নহে, রুদ্রের গান হে কবি গাও,
মোর অধিকার কে নিল কাড়িয়া কহিয়া দাও।
কাঁদিছে পান্থজন
এসেছে মৃত্যুক্ষণ;
শুধু সান্ত্বনা নাহি চাই আজি তোমার কাছে,
নবীন জীবন, নবীন স্বপন সকলে যাচে।

হিমানী ঝরিয়া গিয়াছে ঢাকিয়া চলার পথ,
সেই পথে চলে যাত্রীরা সব, অন্ধবৎ।
এখনো সেতারে তব
ঝংকৃত হবে নব
বিরহ মিলন—হাসি অশ্রুর পুরানো কথা
বিলাস করিয়া করিবে বিলাপ বেদনাহতা?

কোথায় লায়লী মজনুন আজি পৃথ্বী-মাঝে
শুধু ক্রন্দন হাহাকার শুনি শ্রবণে বাজে।
শান্তির অবসর
নাহিক ধরার পর।
কঠিন মাটির নিশ্চয়তায় ভরসা নাহি
নূতন ধরণী গড়ার স্বপন তাই ত' চাহি।

কি স্বপ্ন দেখ হে কবি আজিকে শুনিতে চাই।
বর্তমানের বক্ষ মথিত প্রশ্ন তাই।
পৌষের বায়ু ভরে
পল্লব যায় ঝরে,
রিক্ত হতেছে আজি কুসুমিত শ্যামল ভূমি
হে কবি, এখনো নবীন স্বপ্ন দেখনি তুমি!

মোহাম্মদী, ১৩৫০

কনকভূষণ মুখোপাধ্যায়

যাবার বেলায়

অন্তরে মোর বন্দী মনের পাখী
গান ভুলিয়াছে বেদনার কারাগারে—
মন চায় তারে হিয়ার গোপনে ঢাকি
ঘুম পাড়ানিয়া গান শুনি বারে বারে।

চারিদিকে ভরা বেদনার গানে গানে
গভীর রজনী জাগরণে কেটে যায়—
অগণিত প্রাণ দহনের জ্বালা হানে
ললিত কুজনে ক্ষুধা কিরে মেটে হায়?

আমার পল্লী আজ দহনের বাসা
সেথা ফিরে দেখি সব ক্ষুধিতের দল—
নাইকো মমতা এতটুকু ভালোবাসা
দুই চোখে ভরা মহিমার শতদল।

ঘর ভরা যেথা ছিল ঘরে ঘরে ধান
আজিকে সেথায় হাহাস্বর নাই নাই—
চ'লে যেতে হবে; তবুও মাটির টান
যাবার বেলায় পিছনে টানিছে ভাই।

ভারতবর্ষ, ১৩৫০

দেবনারায়ণ গুপ্ত

আ গ ম নী

শ্মশানের মাঝে এসো মা গৌরী
যেথা চিতা জ্বলে শুধু
প্রান্তরে যেথা শ্যামশোভা নাই
চারদিক করে ধূ ধূ!
সেথায় এবার বসাব বোধন
আগমনী হবে কণ্ঠ-রোদন
কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিব কেবল
তব বেদীতল ঘিরে—
ভাসিতেছি মোরা আজিকে যাহারা
দুখের অশ্রুনীরে।
তব পদতলে লুটায়ে আমরা
দু' মুঠোর লাগি' কেঁদে হব সারা
বরাভয়করা এসো মা এবার
অভয় দানিতে মাগো।
অশিবের দেশে এসো মা শিবানী—
সিংহবাহিনী জাগো।
মায়ের বুকের ক্ষীর-সুধা নাই
মরিয়া বাঁচায়, সন্তান তাই,
অন্তর-শত বেদনা উঠেছে—
আকাশ বাতাস ব্যেপে!
বাজুক তোমার ভৈরবী শিঙ্গা
ধরণী উঠুক কেঁপে।
তুমি এসো মাগো খড়গ হানিয়া
ভাঙো খেলাঘর—সৃষ্টি নাশিয়া
স্থান দাও মাগো চরণপ্রান্তে,
মারিভয় হতে মরি;—
এসো দুর্গতনাশিনী দুর্গে
দুঃখেরে পরিহরি।

ভারতবর্ষ, ১৩৫০

গোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য

জীবন ও মরণ

অতি সংগোপনে,
জীবনের মৃত্যু আসে নিখিলের শাশ্বত প্রাঙ্গণে।
যুগে যুগে মানুষের মুক্তিকামী কোটি কোটি প্রাণ,
এক মহামৃত্যু মাঝে চিরতরে লভিছে নির্বাণ।
অনাসক্ত মহাযোগী—শুদ্ধ-শান্ত-পরিপূর্ণ চিতে,
লভিয়াছে মহামুক্তি আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ নিবৃত্তিতে;
তাহাদের শুভ-ইচ্ছা বহে পরবর্তী বংশধারা,
যে চিন্তা মৃত্যুর মাঝে যুগে যুগে হয় নাই হারা।
মৃত্যু নয় অভিশাপ—মৃত্যু আসে দেবতার বরে,
মরিয়া বেঁচেছে যারা, তারা ব্যাপ্ত বিশ্ব-চরাচরে।
আত্মা পায় অমরতা—মরণের অনন্ত শয়নে—
নিখিলের শাশ্বত প্রাঙ্গণে।
অতৃপ্ত কামনা বুকে চিরজীবী যযাতির প্রেত
জরাগ্রস্ত জীবনের আর্তকণ্ঠে মাগি' অবসান,—
চর্ম তার হয় লোল, কৃষ্ণ কেশ হয় তার শ্বেত,
অশক্ত শরীরে তার তবু ওঠে বসন্তের গান।
মৃত্যু মাঝে মুক্তি নাই, জন্মে তার নাই মধু-স্বাদ,
ক্ষুধিত পরাণ তার কাঁদে শুধু রুদ্ধ হাহাকারে—
জীবনে করিতে স্থায়ী, মৃত্যু সাথে তার বিসংবাদ,
আত্মা তার পীড়াগ্রস্ত—অপ্রাকৃত ব্যর্থ ব্যভিচারে।
জানে না সে ক্ষুদ্র জীব, মরণের অনন্ত মহিমা,
জীবাত্মা বৃহৎ হয় কাটাইলে জীবনের সীমা।
প্রাণী হয় প্রাণময়—মৃত্যুমাঝে আত্ম সমর্পণে—
নিখিলের শাশ্বত প্রাঙ্গণে।

ভারতবর্ষ, ১৩৫০

মৃণালচন্দ্র সর্বাধিকারী

জ ঞ্জা ল

সনাতন ভারতের বাণী—'অমৃতের পুত্র মোরা'
মৃত্যুহীন যজ্ঞের যাজ্ঞিক, সত্য ধর্মে বলীয়ান,
ক্লিষ্ট ক্ষিণ্ন ক্ষুধাতুর জীব পারে না মানিতে আর,
ক্ষীণ কণ্ঠ গর্জে ওঠে অগ্নিগর্ভ স্ফুলিঙ্গ সমান

থাম্ থাম্ ওরে মিথ্যাবাদী, রাখ তুলে কাব্যকথা,
ভুলে যারে পুঁথিগত দর্শনের মিথ্যা ও ছলনা;
দেখ চেয়ে নয়ন উন্মিলি রাজপথের ঐ ছবি—
কি করুণ, বীভৎস মূর্তি ওই উলঙ্গ লাঞ্ছনা!
আহত দলিত পিষ্ট মানবতা করে আর্তনাদ,—
উর্ধপানে বাহু তুলি বিধাতারে দেয় অভিশাপ,
শক্তিহীন নিষ্ফল আক্রোশে গুমরি গুমরি কাঁদে,
তবুও জাগে না বক্ষে বিদ্রোহের অগ্নিভরা তাপ।
বুভুক্ষু ক্লিবের দল চলমান জীবন্ত কঙ্কাল
রাজপথ বেয়ে চলে সভ্যতার অপূর্ব জঞ্জাল।

ভারতবর্ষ, ১৩৫০

নবেন্দু রায়

ন র ক

তখনো ওঠেনি সূর্য
অন্ধকার অরণ্য গুহায়
সদ্যোজাত প্রথম মানুষ
সহচর তখনো পশুর,
লুণ্ঠিত জীবিকা নিয়ে
পশুতে মানুষে যুদ্ধ,
তখনো চৈতন্যহীন
অরণ্যে অজ্ঞাতবাস
মানুষের পাশব শৈশব।
শৈশবের সে-নরক
শুনেছি, দেখিনি চোখে।
তারো চেয়ে ভয়ংকর
প্রত্যক্ষ নরক আজ আমার স্বদেশ!

শকুনির পাখার বিস্তারে
রাহুগ্রস্ত সূর্য আজ মধ্যাহ্ন আকাশে,
মৃত্যুলীন আদি অন্ধকার
ছেয়ে ফেলে দগ্ধতম সংস্কৃত আকাশ—
অকাল শৈশব ফিরে আসে।

মহানগরীর পথে পথে
মানুষে পশুতে যুদ্ধ
জঞ্জালের স্তূপ ঘিরে
প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষুধার বিকার।
স্বর্গ নয়, প্রাগৈতিহাসিক
নরকের বিভীষিকা
হানা দেয় ভয়ার্ত দৃষ্টিতে
কঙ্কালের প্রেতমূর্তি
চিতাচুল্লী শব ও শ্মশান।

পিতা পুত্র জায়া কন্যা
জননী মরিয়া গেছে,
ক্ষুধার্ত রাক্ষসী তার
সন্তানের কঙ্কাল চিবায়।

শৈশবের সে-নরক
তারো চেয়ে ভয়ংকর
নিরন্ন আমার দেশ, এ-দেশ আমার।

অসহিষ্ণু ক্ষুব্ধ মনে
বার বার প্রশ্ন জাগে
এ-নরক আর কতদিন,
দুর্ভিক্ষের তাড়নায়
সঙ্ঘবদ্ধ কঙ্কালের
বজ্রগর্ভ সংহতি কঠিন
কত দেরি আর কত দেরি?

শারদীয় অরণি, ১৩৫০

ফ

আসন্ন শীতে

শীতের হাওয়ায় কেঁপে এরা একদিন
শেষ হয়ে যাবে।
বনানীর পাতা-ঝরা ডালে
তোমরা সেদিন
নির্বিরোধে মেলিবে শিকড়।

তবুও বারেক ভাবো:
কোন্ রসে পুষ্টি তোমাদের?
কত কঙ্কালের হাড়ে তোমাদের শয্যা সুকোমল?
কত শিশু-শবে ছাওয়া তোমাদের উষ্ণ উপাধান?
কত লক্ষ মানুষের বিশীর্ণ বুকের রক্তে
তোমাদের যৌবনের গান?

একবার ভেবে দেখো
(এখনোতো মৃত্যু আছে
তোমাদের অপমৃত্যু এখনোতো রয়েছে সম্মুখে)
এবার থামায়ে ঐ রক্তপায়ী জীবনের গান
ব্যাংকের মিনার ছেড়ে
নটিনীর উরু ছেড়ে
একবার নেমে এসো তবে
চলমান মুক্ত গতি পথে
ক্ষুধাতুর, শীত-শীর্ণ মানুষের ভিড়ে
নেমে এসো রাত্রির তিমিরে।
এরা শেষ হয়ে যাবে, রেখে যাবে দীর্ঘশ্বাস, আর
ক্ষুধার অন্তিম হাহাকার,
গাছের পাতারা হবে পীত
অকাল মৃতের হাড় ব'য়ে নিয়ে যাবে শুধু এবারের শীত।
আরো কত শীত চলে যাবে
(তুমি বুঝি ভাবো)
সুকোমল শয্যাতলে তোমাদের
রক্ষিতা সুরূপা গণিকার

থেকে যাবে রক্তপায়ী চিরজীবী লোলুপ জারজ
(ভাবো বুঝি) তোমাদের এই পন্থা নির্বিরোধ
(ব্যাংকের মিনারে এক) পুষ্পিত সহজ।
কিন্তু এযে কতো বড়ো ভুল
নির্বোধ, বাতুল!
আজ দেখো চেয়ে
যারা আজ ধরণীকে ছেয়ে
আসন্ন শীতের রাতে উৎপীড়িত অন্তিম হাওয়ায়
বিছাতেছে হাড়ের বিছানা,
চিরদিন তারা সহিবে না
অত্যাচার এ পাপের!
সমস্ত জীবন দিয়ে বসন্ত তাদের
আসে ঐ অগ্নি-চূড়,—আসন্ন শীতের
প্রান্তর পারায়ে হিংস্র প্রতিহিংসা-নিপুণ-সঙ্গিন
বিদ্রোহের দিন।

মোহাম্মদী, ১৩৫০

শনিবারের চিঠি ১৩৫০ থেকে

আ ম রা

আমরা পারি না কি?
চাল তেল নুন দাম দশগুণ
চার টাকা সের ঘি—
আমাদের তাতে কিবা আসে যায়,
শঙ্কর রন মোদের মাথায়;
পুড়িলে উদর মোহ-মুদগর
ক'ষে আওড়াই জী—
'পরকালটাই সত্য রে দাদা,
ইহকাল—ছিছিছি।'
(মোরা) ভাগ্যের দাস ভাই,
করি নালিশ বিছানা বালিশ
নিয়ে পথে বাহিরাই।
ভিক্ষা-অন্নে বাঁচি কিছুদিন,
ধীরে ধীরে নাড়ী হয়ে এলে ক্ষীণ
পড়ে চিতপাত করি বাজি মাত,
মরিতে মরিতে গাই—
'সবার উপরে মানুষ সত্য,
তাহার উপরে নাই।'

হি সা ব

সংশয়ের মাঝে থাকি, তাই বুঝি ধ্রুবের মহিমা,
অসীমের ব্যাকুলতা থাকিবে কি, ভেঙে গেলে সীমা?
জাগরণ খুঁজে মরি, থেকে থেকে ঘুম আসে বলে—
জীবন দুর্লভ এত বিশ্বব্যাপী মরণের কোলে।

দু র্দি ন

আতঙ্কিত এ নগরী ঝিমাইছে গাঢ় অন্ধকারে
সব আলো নিবে গেছে, পথে নাই লোক-চলাচল;
'মাগো খেতে দাও' বলি সহসা কে কাঁদিল দুয়ারে,
তন্দ্রাহত নিশীথিনী, হ'ল যেন ব্যথায় বিকল।
আকাশ মথিত করি শূন্যে শূন্যে ধায় সে ক্রন্দন—
মহাকাল গতি যেন স্তব্ধ হয় কালের আঘাতে;
ক্ষণিক জীবন, তার বিফল সকল আয়োজন,
মহাকালী নরমুণ্ড গেঁথে যায় গলার মালাতে।
মোদের ধরিত্রী মাতা ভিখারিণী সম অসহায়,
স্তনে তার স্তন্য নাই; নিরুপায় সন্তানের ভার
বহিতে পারে না মাতা—মাটি হতে শুধু 'হায় হায়'
ধ্বনি উঠে অবিরাম, মৃত্যু খোলে আপনার দ্বার।
দুর্দিনের অন্ধকারে দেখি নাকো, শুধু শুনি কানে,
জীবনের চিরন্তন মরণের টানে।

ডা য়া লে ক টি ক

মন্বন্তরে প্রতিবিম্ব, বাসে চেপে শুক্ল-অভিসার
ফাটে কি ফাটে না স্টোভ, ময়দানবের হাহাকার—
পুজো আর ঈদে পাল্লা, হাল্লা উঠে পূর্ব্বাশা-সীমায়
নীবিবাঁধা লেত্তি-টানে বিশ্বলাট্টু আয়েসে ঝিমায়।

কো জা গ রী

কে জাগে নিশীথে অন্ধকারের ভাষা কে শুনিতে পায়,
গুরু গুরু ডাক মাটির বুকেতে ভূমিকম্পের আগে;
এই পৃথিবীর পাপ-মন্থনে নভোনীল মূরছায়
তাহারাই তাহা অনুভবে জানে নিশীথে যাহারা জাগে।
আমরা জাগি না, আমরা ঘুমাই সুতরাং ভীত নই;
জেগে উঠে দেখি মৃত্যু-পাথার চারিদিকে থৈ থৈ।